শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ
আশুতোষ লাইব্রেরী

উপহার

সূচীপত্র

আলাদীনের প্রদীপের অদ্ভুত ভোজবাজীর মত ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল

গল্প-বিতান

উপহার

—১—

এম. ই. স্কলারশিপ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়ে বৃত্তি নিয়ে নন্দলাল যখন সহরের হাইস্কুলে এসে ভর্ত্তি হ'ল, তখন স্কুলে একটা সাড়া প'ড়ে গেল। তার মত অত বেশী নম্বর পেয়ে এপর্য্যন্ত কেউ ফার্ষ্ট হয় নি। তা ছাড়া তার বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ—স্বভাবও তেমনি মধুর; সে যেন স্কুলের গর্ব্বের বস্তু হয়ে উঠল। মাষ্টার মশায়রা নিজেরা আলোচনা করতেন—নন্দলালকে ঠিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ম্যাট্রিকুলেশনে তাকে দিয়ে স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি করা যাবে—আশা করা যায়।

নন্দলালকে ভর্ত্তি করা হ'ল সেভেন 'বি'-সেক্‌সনে। 'এ'-সেক্‌সনে ছিল ক্লাসের ফার্ষ্ট বয় অসীম মুখার্জ্জি। দুই সেক্‌সন প্রতিযোগী দল হয়ে দাঁড়াল। কোন্ সেক্‌সন থেকে এবার ফার্ষ্ট হবে এই হ'ল গবেষণার বিষয়। মাষ্টার মশায়রাও এই প্রতিযোগিতায় আনন্দ অনুভব করতেন। পণ্ডিত মশায় একদিন 'এ'-সেক্‌সনে বললেন—"নন্দলাল স্কুলের আদর্শ ছেলে। আমাদের জ্যোতিষচন্দরের মত পাঁচটা প্রাইভেট টিউটরের মাথা গুলিয়ে সোরাবজীর সরবৎ ক'রে খেয়ে, তাকে ফার্ষ্ট হ'তে হয় নি। সে যা-কিছু করেছে নিজের বাহুবলে। সে হচ্ছে কলির একলব্য।"

জ্যোতিষ রায়বাহাদুরের ছেলে। প্রাইভেট টিউটর অনেকগুলো আছেন; তাই পড়াশুনায় মাথা খাটায় কম—যেন নিজের চেয়ে তাঁদের গরজটাই বেশী। সে বলল—"তা হোক স্যার, আমাদের সেক্‌সনেও গাণ্ডীবধারী অসীম মুখার্জ্জি রয়েছে। তা ছাড়া—"

জ্যোতিষের কথা শেষ করতে না দিয়েই হরিদাস, সলিল, মণি সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠল—"আমরাও তো সঙ্গে রয়েছি স্যার।"

পণ্ডিত মহাশয় হেসে উঠলেন—"তা বটে! গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের রথের চূড়ায় ব'সে সবাই মিলে লাঙ্গুল নেড়ে খুব হুঙ্কার দিতে থাকবে।"

সমস্ত ক্লাসে হাসির রোল প'ড়ে গেল। পণ্ডিত মশায় আবার বললেন—"এ তো বাবা, টাগ্-অব্-ওয়ার নয় যে, দেহের জোরে সব দড়িটাই একদিকে টেনে নেবে। এ যে মাথার শক্তির পরীক্ষা। এখানে বন্ধুবান্ধবের সাহায্য কোন কাজেই আসবে না।"

অসীমকে কেন্দ্র ক'রে এই আলোচনায়, সে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে—লজ্জায়, কুণ্ঠায় আরক্তিম মুখে মাথা নীচু ক'রে ব'সে থাকে, আর মনে মনে ডাকে সেই লজ্জানিবারণ শ্রীমধুসূদনকে—যিনি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছেন, প্রহ্লাদকে শত শত বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, ধ্রুবের মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন; সেই ভকতবৎসল শ্রীহরি যেন তাকে লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার করেন, স্কুলে তার মুখ দেখাবার উপায় রাখেন!

* * *

প্রথম কিছুদিন নন্দলালের সঙ্গে অসীমের ব্যবহারে, আলাপ-পরিচয়ের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠে না—একটু দূরত্ব যেন থেকেই যায়। অসীম ভাবে, সে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী; তাই যেন তার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে না। কিন্তু নন্দের সৌজন্য ও অমায়িক সরলতা অসীমকে মুগ্ধ করে।

রবিবার। অসীম কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সহরতলীর দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে। পথে নন্দের সাথে দেখা। সে কিছুতেই

তাদের ছাড়ল না—সঙ্গে ক'রে বাড়ী নিয়ে গেল; বলে—“আমাদের বাড়ীতে দালান নেই ব'লেই বুঝি যেতে চাচ্ছ না?”

অসীমেরা লজ্জিত হয়; বলে—“বাঃ-রে, তা মনে করব কেন? আমরাই বা কি রাজা-মহারাজা!”

নন্দদের বাড়ী ছোট; মাটির ঘর—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাম্‌নে ছোট একটা বাগান। তাতে কতকগুলো দেশী ফুলের গাছ বেশ যত্ন ক'রে লাগান। নন্দের বাবা সূত্রধর; তাঁর নিজের ব্যবসাই করেন। তিনি কাঠের কাজে যেরূপ নিপুণ, সেই অনুপাতে অর্থোপার্জ্জন তাঁর ভাগ্যে হয় নি। সেদিন তিনি কি একটা কাজ করছিলেন। সবাই গিয়ে তাঁকে ঘিরে বসল। নন্দ তাদের পরিচয় করিয়ে দিল। কি তৈরী করবেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—“নন্দের জন্য একটা উপহার—বুককেস্। মনে করছি এটাকে সেনেট হলের কার্নিশের প্যাটার্ণে গড়ব। সেনেট হল দেখেছ? সেটা যেন শিক্ষার আদর্শের প্রতীক। সরল অথচ দৃঢ়; কেমন একটা মহানভাবে মণ্ডিত। দেখ, ঐ বাঙলার বাঘের মতই—”

এই ব'লে তিনি দেওয়ালে লাগান স্যার আশুতোষের একখানা বড় ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি সেই ছবির উপর গিয়ে পড়ল। নন্দের বাবা বহুক্ষণ একদৃষ্টে সেই প্রশান্ত গম্ভীর প্রতিভা-দীপ্ত মুখের দিকে শ্রদ্ধাভরে চেয়ে থাকলেন। অসীম অনুভব করল—নন্দের

বাবা নীরবে কি উপদেশ তাদের অন্তরের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিলেন। এমন সময় নন্দের মা এসে বললেন—"তোমরা গরীব ভাইএর বাড়ীতে এসেছ; কি-ই বা দেব! চারটে ক'রে মুড়ি দিই তেল-লবণ মেখে, কেমন?"

অসীম সহজভাবে বলল—"তাই ভাল মা। আমরা সবাই একসঙ্গে খাব।"

নন্দের মা ভারী খুশী হলেন; আন্তরিকতার সহিত অসীমদের কাছে ব'সে খাইয়ে তাদের যাবার সময় বললেন—
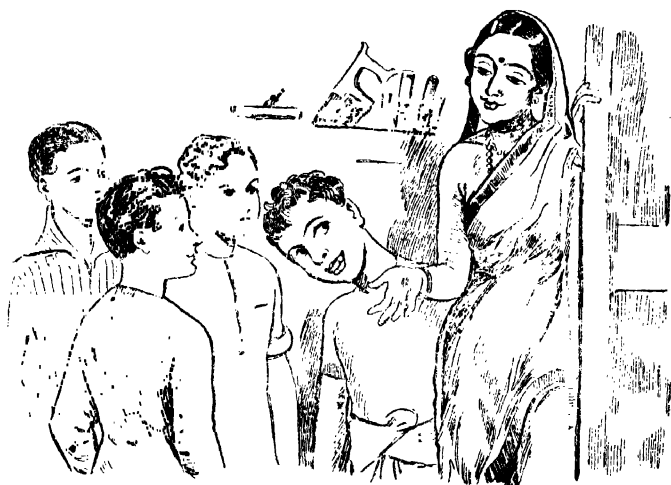
"আজকে পরিচয় ক'রে গেলে; এই রকম মাঝে মাঝে এসো। না এলে কিন্তু রাগ করব।" ... ...

অসীম বাসায় এসে বাবার কাছে আবদার করল, 'তার

একটা বুককেস্ চাই সেনেট হলের প্যাটার্ণে গড়া। টেবিলের উপর বই গুছিয়ে রাখা ভাল হয় না—কালী প'ড়ে গেলে বই-খাতা সব নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া ছবি, বাদল, মীরা এরা সব গিয়ে নাড়াচাড়া করে—কবে হয়ত ছিঁড়েই ফেলবে। নন্দের বাবাও তার জন্য একটা বুককেস্ তৈরী ক'রে দিচ্ছেন।

অসীমের বাবা হেসে বললেন—"এতগুলো কারণ যখন বর্ত্তমান তখন বুককেস্ তো একটা না হ'লেই চলে না। কিন্তু আরজীতে প্রধান কারণটাই সকলের শেষ প'ড়ে গেছে।"

সলজ্জ হাসি হেসে অসীম দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। পরদিন সকালে সে তার বাবার সঙ্গে সহরের সব কাঠের আসবাবের দোকানে খোঁজ করল, কিন্তু কোথাও পছন্দমত বুককেস্ একটিও পেল না। কেউ কেউ বলল—নক্সা দেখালে ঠিক সেই রকম তৈরী ক'রে দিতে পারে।

—২—

মাস খানেক পরের কথা। অসীমের বাবা বিকালে কোর্ট থেকে বাসায় ফিরলেন; সঙ্গে কুলীর মাথায় একটি বুককেস্। তিনি বাসায় এসেই অসীমকে ডেকে বললেন—"অসীম, এই দেখ তোমার বুককেস্, ঠিক সেনেট হলের ভাবই আসে; আর পাশের পিলারগুলো তো অবিকল সেইরূপ।"

এত সুন্দর পালিশ আর বার্ণিশ যে কাঠের উপর মুখ

দেখা যায় ! আনন্দে অসীমের চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে থাকে। সে জিজ্ঞাসা করল—"কোন্‌ দোকানে পেলে বাবা ?"

অসীমের বাবা বললেন—"দোকানে নয়। কোর্টের সাম্‌নে কে একজন বিক্রী করতে এনেছিল। ঠেকে পড়েছিল বোধ হয়, তাই দামও বেশী হাঁকে নি। নতুবা এর দাম সাত টাকা খুব কমই বলতে হবে।" ... ...

পরদিন শনিবার। স্কুলে গিয়ে অসীম নন্দের খোঁজ করল। তার বুককেস্‌ নন্দকে দেখান দরকার। নন্দরটাও সে গিয়ে দেখে আসবে। নন্দের বাবা খুব একজন ওস্তাদ লোক। তারটা হয়তো এর চেয়ে ভালও হ'তে পারে। তা হ'লেও প্রতিযোগিতায় অসীমেরটাও খারাপ বলবার জো নেই। সে মনে মনে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করতে লাগল। স্কুলে গিয়ে শুনল নন্দ অনেক দিন থেকে অনুপস্থিত। তাই বিকালের দিকে সে একাই নন্দদের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল।

নন্দের টাইফয়েড। কেমন শীর্ণ, পাংশু হয়ে বিছানার সঙ্গে লেগে গেছে ; চেনাই যায় না। মাথার চুল ছোট ছোট ক'রে কেটে দেওয়া হয়েছে। নন্দের মা চৌকির উপর নন্দের মাথার কাছে ব'সে ছিলেন। সমস্ত বাড়ীতে কেমন একটা বিমর্ষ স্তব্ধতা। এরূপ দৃশ্যের জন্য অসীম মোটেই প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে সে একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল ; পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে নন্দের পাশে গিয়ে বসল এবং সসঙ্কোচে

বলল—"ওর অসুখের কথা আমরা মোটেই জানি না। কতদিন থেকে এরকম?"

নন্দের মা বললেন—"এই তো বাবা, তেইশ দিন। প্রথমে ম্যালেরিয়া জ্বর ব'লে আমরা সেরকম গা লাগালাম না। পরে ক্রমে বেশী দেখে ডাক্তার ডাকা হ'ল। তিনি বললেন—টাইফয়েড। মাঝটায় কি বিপদেই পড়েছিলাম, বাবা! জ্ঞান মোটেই ছিল না। কত কি আবোল-তাবোল সাতরাজ্যের কথা বলত। মধ্যে মধ্যে তোমাদের নামও শুনতাম। এখনও মাঝে মাঝে ওরকম বলে; তবে খুব বেশী নয়।"

নন্দের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে মা ডাকলেন—"নন্দ, বাবা, দেখ তো কে এসেছে। দেখ—এই তোমার পাশেই বসেছে।"

নন্দ অসীমের দিকে তাকাল। ভাষাহীন, ভাবহীন সে দৃষ্টি। সে অসীমকে চিনতে পারে নি; তার দিকে চেয়ে থাকল। অন্তরে অন্তরে যেন তার মূর্ত্তি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল—চিনতে পারে কিনা! নাঃ—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে মুখ ফেরাল। অসীমের বুকের মধ্যে খচ্-খচ্ করতে লাগল।

এমন সময় নন্দের বাবা ওষুধ নিয়ে এলেন। গ্লাসে এক দাগ ঢেলে তিনি এগিয়ে গিয়ে নন্দকে ডাকলেন। ওষুধের গ্লাস দেখেই সে বিগড়ে উঠল—"আমি খাব না—কিছুতেই খাব না। আমার বুককেস্ আগে এখানে আন—তার মধ্যে শিশি, কমলা সব রাখ—তারপর খাব—"

নন্দের বাবা বললেন—"ওটা তো তোমার ঘরেই রয়েছে। তুমি ভাল হয়ে উঠ; দু'জনে ধ'রে নিয়ে আসব। আমি একলা আনি কি ক'রে?"

অসীম বলল—"আচ্ছা, চলুন; আমি যাচ্ছি। ওটা না হয় এই ঘরেই রাখুন। তবু ও ওষুধ খাক।"

নন্দের বাবা বিষণ্ণমুখে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নন্দের মা চাপা গলায় বললেন—"সেটি কি আর আছে বাবা! অভাবের সংসার। তার উপর ওষুধপত্তর, ফল-পথ্যি, ডাক্তার-বদ্যির খরচ। এতদিন প্রাণ ধ'রে রেখেছিলাম। কিন্তু জীবনের চেয়ে বেশী তো আর কিছু নয়। সেদিন সাত টাকায় সেটিকে বিক্রী ক'রে তবে এ কয়দিন চ'লে গেল।

নন্দের আদরের জিনিসটাকে দায়ে প'ড়ে ছাড়তে হয়েছে, তাই মায়ের কণ্ঠ ব্যথাতুর। অসীম উঠে দাঁড়াল। তার বুঝতে বাকী রইল না যে, নন্দদের টাকা নেই, তাই তার সখের উপহার আজ অসীমের ঘরে গিয়ে উঠেছে। নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর সে আবার ফিরে এল। চাকরের মাথায় সেই বুককেস্। সেটিকে নন্দের বিছানার পাশে দাঁড়া করিয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে নন্দের বিছানায় গিয়ে বসল। নন্দের বাবা ও মা অবাক হয়ে রইলেন।

শেষে অসীমের কাছ থেকে তার বুককেস্ কেনা সম্বন্ধে

সব কথা জেনে নিয়ে, নন্দের বাবা বললেন—"তা বেশ ভাল বুদ্ধিই করেছ, অসীম। তোমার বাবাকে আমাদের অবস্থাটা

বুঝিয়ে ব'লো; টাকা ক'টা আমি কিছুদিন পরে শোধ ক'রে দেব।"

অসীম মৃদু হেসে বলল—"আপনি কি যে বলেন। আমি তো কিনি নি যে দাম আমাকে ফেরৎ দেবেন। এটা আমি নন্দকে উপহার দিলাম।"

নন্দের বাবা-মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু টল-টল করতে লাগল। তাঁরা কৃতজ্ঞ-বিস্ময়ে অসীমের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁদের চোখ দিয়ে যেন অজস্র আশিসধারা বর্ষিত হ'তে লাগল।

প্রতিদান

—১—

অন্নদাপ্রসন্নবাবু অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির লোক। তাঁর মেজাজের কিনারা করাও কঠিন। কি একটা কারণে ছোটভাই সারদাবাবুর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য ঘটে। তার ফলে সমস্ত সম্পত্তি তিনি ভাইএর সঙ্গে পৃথক্ ক'রে নেন। শুধু তাই নয়; বাড়ীর মধ্যে প্রাচীর উঠল এবং উভয় পরিবারের মধ্যে সকল প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল, এমন কি কথাবার্ত্তাও বন্ধ হ'ল। বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও অন্নদাবাবুর ভয়ে অন্য বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রকাশ্যে আলাপ করবার সাহস পেত না। অন্নদাবাবু প্রায়ই এই নীতিবাক্য বাড়ীর মধ্যে প্রচার করতেন—'যে শত্রু, বিশেষ ক'রে ঘরের শত্রু, তাকে সব সময়ই দূরে রাখতে হয়, এই হচ্ছে চাণক্যের উপদেশ।'

দুই বাড়ীর দুই ছেলে এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। বাড়ীতে তাদের প্রায়ই দেখাশোনা হয় না; হ'লেও অপরিচিতের মত এ ওর পাশ কাটিয়ে যায়, কথা হয় না। তাদের মিলনক্ষেত্র স্কুলে, সেখানে তা'রা দু'জনে পরম বন্ধু;

তাদের বাবা-কাকার মনান্তরের প্রতীকার তা'রা ক'রে দু'ভাইএর পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের দ্বারা।

সারদাবাবুর ছেলে সুকুমার ক্লাস থ্রি থেকে এইট্ পর্য্যন্ত বরাবর ফার্ষ্ট হয়ে এসেছে। অন্নদাবাবুর ছেলে অশোক লেখাপড়ায় মাঝারি রকম ছাত্র, কিন্তু খেলাধূলার ব্যাপারে স্কুলের সম্মান রাখতে হ'লে তাকে না হ'লে চলে না। সে স্কুলের চ্যাম্পিয়ান স্পোর্টস্ম্যান। তাকে বাদ দিলে ফুটবল, ক্রিকেট সব টীমই পঙ্গু হয়ে পড়ে। সুকুমার আর অশোক ক্লাসে প্রতিদিন পাশাপাশি বসে। তাই পণ্ডিতমশায় কৌতুক ক'রে তাদের নাম দিয়েছেন 'অভেদাত্মা হরিহর মিত্র', কখনও বা বলেন 'শুম্ভ-নিশুম্ভ'।

সেদিন পণ্ডিতমশায়ের ছেলে এসে বলেছে ফার্ষ্ট টারমিনাল পরীক্ষায় সংস্কৃতে অশোক পেয়েছে ছিয়াশী আর সুকুমার একান্ন। এই অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয়ে ক্লাসে নানারূপ জল্পনা, গবেষণা চলেছে। অশোক খুব উৎফুল্ল, কিন্তু সুকুমার মোটেই বিষণ্ন নয়। বে বলল—"আমি কি চিরকালই ফার্ষ্ট হবার সনদ নিয়ে এসেছি নাকি!"

এমন সময় পণ্ডিতমশায় পরীক্ষার খাতাগুলো বগলে নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। মুখ দায়রা-জজের মত গম্ভীর; কিন্তু অন্তরের সরস সন্তোষ তাঁর ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের আবরণ ভেদ ক'রে চোখে মুখে ফুটে উঠছিল। সকল বিস্ময়ের নিরসন ক'রে তিনি

বললেন—"বাবা, এ শর্ম্মার চোখে ধুলো দেওয়া বড় সোজা নয়! সুকুমারের লেখা খাতার উপর অশোক মিত্রের নাম থাকলেই যে সেটি আমি অশোকের খাতা ব'লে ধ'রে নেব এত আশাই করেছ? হাজার লেখার মধ্যেও কোন্‌টি সুকুমারের 'আকার' কোন্‌টি অশোকের 'ইকার' আমি তা বের ক'রে দিতে পারি।"

মৃদুহাস্যে মাথা চুলকাতে চুলকাতে দাঁড়িয়ে অশোক বলল —"এ কিন্তু অন্যায় স্যার! আইনমত খাতায় যার নাম আছে, নম্বর তারই প্রাপ্য।"

পণ্ডিতমশায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলে—"আমার আইন আমার হাতে। আমিই বিচারক, আমিই পেনাল কোড্‌। জালিয়াতি ক'রে বড় হওয়া যায় না।"

এর উপর আর প্রতিবাদ চলে না। অশোক পেনাল কোডের ভয়ে ব'সে প'ড়ে অন্যের সঙ্গে চোখ টেপাটিপি ক'রে হাসতে লাগল। সুকুমার অপরাধীর মত মাথা নীচু ক'রে হাসি চেপে জ্যামিতির চিত্রগুলো গভীর অভিনিবেশ-সহকারে দেখতে আরম্ভ করল, যেন তার মধ্য থেকে ভুল বের করতে হবে!

—২—

কয়েকদিন পরে, রাত্রি তখন ন'টা হবে। সুকুমার তার পড়ার ঘরে একাকী টেবিলের কাছে ব'সে পড়ছিল। হঠাৎ

তার সাম্‌নে কতকগুলো গোকুল পিঠে এসে পড়ল। বিস্মিত হয়ে ফিরে চাইতেই দেখে পিছনে অশোক দাঁড়িয়ে হাসছে। একখানা চেয়ার কাছে টেনে নিয়ে সে বলল—"সাবধান, গোলমাল করিস্‌ নে। খাবার সময় হাতসাফাই করেছি।

এ বিদ্যেও আছে, কেবল তোর মত এক বিদ্যার মালিক নই! এখন তাড়াতাড়ি এগুলোর সৎকার্য্য ক'রে ফেল।"

সুকুমার বলল—"দাঁড়া, জল আনাই।"

—"তুমি দেখছি চোর না ধরিয়ে দিয়ে ছাড়বে না! তার চেয়ে আমিই বরং তোর মুখে তুলে দিই। তবে আগেই ব'লে রাখি, চিরদিনের অভ্যাস বশতঃ নিজের মুখেও কিছু কিছু উঠবে কিন্তু"—ব'লে সে হেসে উঠল।

খেতে খেতে অশোক বলল—“কতদিন ত যুক্তি করেছি অজ্ঞাত দেশের রহস্যের সন্ধানে আমরা বের হব—বেন্ হেডিন্, ডক্টর নান্সেন, স্কট্ এদের মত। জগতের সাম্নে প্রমাণ করব যে, আমরা ভীরু শয্যাবিলাসী নই; বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে দান করবার ক্ষমতা আমাদেরও আছে। তার আগেই চল একটা ছোটখাট ‘টুর’ দিয়ে আসি। ঠাকুরগাঁয়ে আমাদের ক্রিকেট টীম নিয়ে যাচ্ছি। তুমিও এবার আমাদের সঙ্গে চল না?”

সুকুমার হাসতে হাসতে বলল—“তা বটে! আমি না গেলে তোমাদের দলে ব্র্যাডম্যানের অভিনয় কে করবে?”

অশোক উত্তর দিল—“না, না, সেজন্য নয়। তুমি হবে আমাদের অভিযানের ঐতিহাসিক। সঙ্গে আমরা ক্যামেরা নিচ্ছি। গ্রুপ্ ফটো নেব; ভাল সিনারী পেলে নেওয়া হবে। এ সব গুছিয়ে বেশ ভাল রকম একটা ভ্রমণ-কাহিনী স্কুল ম্যাগাজিনে দিতে হবে। কাজেই তোমার স্বচক্ষে সব দেখা দরকার।”

—“সখ দেখছি বাদশাহের মত। আমাকে বুঝি আকবরের ‘নবরত্নের’ মধ্যমণি আবুলফজল সাজতে হবে?”

এমন সময় সুকুমারের ছোট বোন পিকু তাকে খেতে ডাকতে এল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো কোঁকড়ান চুল তার পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। কাজলা মেয়ে, অনিন্দ্যসুন্দর

মুখশ্রী ; হরিণের মত টানা টানা কালো ডাগর চোখে দুষ্টুমি-ভরা। অশোক তাকে বলল—“এলোকেশী কৃষ্ণকলি, আমাদের জন্য খাবার জল নিয়ে এসো গে যাও। আর আমি যে এসেছি তা কাউকে ব'লো না—তবে তোমাকে খুব সুন্দর ছবির বই দেব, কেমন ?”

পিকু মাথায় এক ঝাঁকানি দিয়ে চুলের উপর ঢেউ তুলে দৌড়ে গেল এবং খানিক পরে জল নিয়ে এল ; সঙ্গে রেকাবীতে কিছু মিষ্টি। জল পান ক'রে অশোক চ'লে গেল। কথা থাকল সুকুমার তার বাবার অনুমতি নিয়ে অশোকদের সঙ্গে ঠাকুরগাঁয়ে যাবে।

—৩—

খেলার মাঠে বেশ জনসমাগম। খেলাও খুব জমে' উঠেছে। এ পর্য্যন্ত অশোক এমন সুন্দর ও দৃঢ়ভাবে ব্যাট করছে যে, দর্শকগণ ঘন ঘন উল্লাসধ্বনি ক'রে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। সকলের মুখেই অশোকের প্রশংসা। গর্ব্বে সুকুমারের বুক ফুলে উঠে।

অশোকের বিভিন্ন ভঙ্গীর কয়েকটা ফটো নেওয়া হয়েছে। আরও একটা ফটো তুলবে ব'লে সুকুমার ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে' গেল। হঠাৎ বলটি তীব্রবেগে গিয়ে অশোকের মুখে এমনভাবে

লাগল যে, সে মাথা ঘুরে সঙ্গে সঙ্গে প'ড়ে গেল—ছাত্রেরা ছুটে' গেল। শিক্ষকেরাও গেলেন। সুকুমার দৌড়ে গিয়ে ভীড় ঠেলে অশোকের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। অশোকের চক্ষু নিমীলিত; মুখ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে—সে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে এলিয়ে পড়েছে। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক জনে ধরাধরি ক'রে অশোককে তাঁবুর ভিতর নিয়ে গেল।

কয়েকজন ছুটল ডাক্তারের জন্য। মাথায় জলের ছিট্, বরফ, পাখার বাতাস দেওয়া হ'ল, কিন্তু কিছুতেই রক্তপড়া বন্ধ হয় না। ডাক্তারবাবু এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন—"একটা দাঁত একেবারে ভেঙ্গে উঠে গেছে। রক্তপাতে খুব দুর্ব্বলও হয়ে পড়েছে। এখন এ অবস্থা বন্ধ করতে না পারলে তো একে বাঁচান কঠিন।"

ডাক্তারের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখে ছাত্রদের মুখ শুকিয়ে উঠল। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। সুকুমার কাতরস্বরে বলল—"এখন একটা উপায় করুন। কি ওষুধ দেবেন, আমাদের কি করতে হবে বলুন। যদি বলেন তো বাড়ীতে টেলিগ্রাম ক'রে দিই।"

ডাক্তার মিঃ ঘোষ বললেন—"তা টেলিগ্রাম একটা ক'রে দাও। কিন্তু দরকার হচ্ছে একে এখনই ব্লাড্ ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া। রক্ত পড়াতে যেরকম সাদা ফেকাশে হয়ে পড়েছে তাতে এখন নূতন রক্ত না দিলে এর জ্ঞানই হয়তো আর ফিরে

আসবে না। এ ছেলেটির ফ্যামিলীর এমন কেউ এখানে আছে কি—যে নিজের রক্ত দিতে পারে ?”

সুকুমার ডাক্তারের সাম্‌নে এগিয়ে গিয়ে বলল—“আমি ওর ভাই। আমার রক্ত নিন।”

সুকুমারের স্বাস্থ্য খুব ভাল নয়। কিন্তু অশোকের প্রাণের জন্য সে যে তার নিজের প্রাণ দিতে পারে। ১০ সি. সি. রক্ত

দেবার সময় তার মাথার মধ্যে ঝিম্‌-ঝিম্‌ ক'রে দেহ অবশ হয়ে এল ; কিন্তু মুখে সে একটুও কাতরোক্তি করল না। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেও সে বললে না যে শরীরে অবসাধ বোধ করছে। কি জানি যদি রক্ত নেওয়া বন্ধ ক'রে দেয়!

ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার পর অশোকের রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল এবং শেষরাত্রির দিকে তার জ্ঞান ফিরে এল। সুকুমার মাথার কাছে ব'সে ছিল। চামচ দিয়ে গরম দুধ তুলে অল্প অল্প ক'রে সে অশোকের মুখে দিতে লাগল। অন্য সকলেই পালা ক'রে একবার ক'রে ঘুমিয়ে নিল, কিন্তু সুকুমার কিছুতেই ঘুমাতে গেল না। শুশ্রূষায় এইভাবে রাত্রি কেটে গেল।

সকালে অশোক একটু সুস্থ বোধ করাতে ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তা'রা দিনাজপুরে রওনা হ'ল। ষ্টেশন থেকে ষ্ট্রেচারে ক'রে অশোককে বাড়ী নিয়ে গেলে প্রথমে বাড়ীর ভিতর কান্নার রোল প'ড়ে গেল।

মিঃ ঘোষ অন্নদাবাবুকে বললেন—"এখন আর আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তবে একথা বলতেই হবে যে, অশোকের জীবন এবার সুকুমারের রক্তের বিনিময়ে কেনা।"

সমস্ত ঘটনা শুনে অশোকের মা নীরবে শিউরে উঠলেন। অন্নদাবাবু লজ্জায়, বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—"কই সুকুমারকে দেখছি না যে!"

শচী গিয়ে সুকুমারকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে এল। অন্নদাবাবু তাকে আবেগভরে বুকে জড়িয়ে ধ'রে সস্নেহে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—"হাজার হোক রক্তের টান যাবে কোথা? আজ থেকে তোমরা আপন দু'ভাই।"

নিজের অজ্ঞাতসারেই দু'ফোটা অশ্রু তাঁর চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

অন্নদাপ্রসন্নবাবুর মত কঠিন মানুষ যে এতখানি কোমল হ'তে পারে সুকুমার তা স্বপ্নেও ভাবে নি। সে নত হয়ে জ্যাঠামশায়ের পদধূলি নিয়ে অশোকের দিকে চেয়ে দেখে নির্ম্মল আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শারীরিক যন্ত্রণার কোন চিহ্নই সেখানে নেই!

অপরাধী

—১—

সারাদিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বৃষ্টি থেমে গেল। আবার রাস্তায় লোক চলাচল স্বুরু হয়েছে; কিন্তু যাদের একান্ত বের না হ'লেই নয় শুধু এমন লোকই আজকের দিনে ঘরের বাইরে এসেছে। সখের ভ্রমণকারীরা কেউ বাদলা হাওয়া খেতে মাঠের দিকে যাচ্ছে না। জমাট মেঘে আকাশ থম্-থম্ করছে। কখন কখন ঝম্-ঝম্ ক'রে বৃষ্টি নামে।

এমনি দিনে সহরের এক দরিদ্রপল্লীতে মাটির দেয়াল-ঘেরা এক খোলার ঘরের কোণে এগার-বারো বছরের এক কিশোর বালক ম্লানমুখে তার বিধবা মায়ের রোগশয্যা-পার্শ্বে ব'সে ছিল। মেঝেতে চাটাই পাতা, তার উপর ছেঁড়া মাদুর ও পুরাণো কাপড়-বিছানো শয্যা। রোগশীর্ণা জননী একখানা জীর্ণ গাত্রবস্ত্রে সর্ব্বদেহ আবৃত ক'রে নিস্পন্দভাবে বিছানায় শুয়ে আছেন। জলের ছাঁটে ঘরের দেয়ালের স্থানে স্থানে ধ্বসে পড়েছে; মেঝে আর্দ্র। খোলার চালার ফাঁক দিয়ে মেঘমুক্ত

রজনীতে তারার হাসি দেখা যায়। শ্রাবণের বৃষ্টিধারা মেঝেয় প'ড়ে কয়েকস্থানে ছোট ছোট বাটির মত গর্ত্তের সৃষ্টি করেছে।

সারাদিন মায়ের পেটে কিছু পড়ে নি—ছেলেরও না। মায়ের শিয়রে ব'সে তাঁর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ভজা জিজ্ঞাসা করল—"মা মাগো, এখন কেমন লাগছে?"

পুত্রের আহ্বানে জননী হাত দিয়ে বুক দেখিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—"বড় ব্যথা।"

দুঃখের সংসার। অনাথা কায়ক্লেশে অন্যের বাড়ী কাজ ক'রে একমাত্র সন্তান ভজাকে বুকের কাছে নিয়ে রাত কাটান; আর শুয়ে শুয়ে সেই অনাগত সুখের দিনের স্বপ্ন দেখেন—

যেদিন ভজা উপার্জ্জন করতে শিখবে, সেদিন তাঁর দুঃখের অবসান হবে। সেই সুখের দিনের আশায় দুঃখিনী জননী দুঃখকে দুঃখ ব'লে মনে করেন না ; পুত্রকে কোথাও কাজে লাগিয়ে দিয়ে নিজের একটু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন নি। অভাব-অনটন, দুঃখ-দৈন্য সত্ত্বেও তিনি তাকে মিউনিসিপ্যালিটির এম. ই. স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছিলেন। জননী তাঁর অন্তরের সকল স্নেহ দিয়ে পুত্রকে মানুষ করার চেষ্টা করছেন—দুর্য্যোগের দিনে পক্ষিণী যেমন আপন পাখার আড়ালে শাবককে ঢেকে ঝড়বৃষ্টি নিজে মাথা পেতে নেয়, তেমনি ক'রে।

মায়ের কষ্টে ভজার চোখ ফেটে জল এল। কিন্তু কী প্রতীকার করবে সে! তার মুখে ভাষা ফোটে না যে একটা সান্ত্বনার কথা মাকে বলে। হৃদয়ের সকল আকুলতা হাতে মেখে সে মায়ের বুকে, মুখে, কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। ইতিহাসের বইয়ে সে পড়েছে যে, বাবর তাঁর পুত্র হুমায়ুনের ব্যাধি নিজের দেহে নিয়ে নিজের পরমায়ু পুত্রকে দান করেছিলেন। সেও ভাবে মায়ের অসুখটা যদি সে নিজের শরীরে নিতে পারত!

তার মনে হ'ল অনাহারের জন্য হয়ত তার মায়ের যন্ত্রণা আরও বেশী হচ্ছে। কিন্তু কি সে খেতে দেবে? ঘরে যে কিছুই নেই। তার নিজের অসুখের সময় মা তার জন্য একটা ডালিম এনে দিয়েছিলেন। এখন একটা ডালিম পেলেও ত

একটু রস ক'রে দিতে পারত মায়ের শুষ্ক জিভের উপর! মনে হ'ল দোকানদারকে তার দুঃখের কথা বললে সে একটা ছোট রকমের ডালিমও কি দেবে না? হয়ত দিতেও পারে। আর এমনি সে না দেয়, না হয় ধারেই আনবে। এমনি কত কি ভাবতে ভাবতে, তন্দ্রাচ্ছন্ন জননীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, ভজা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাজারের মধ্যে বিরাটদেহ কাবুলীর মেওয়ার দোকানের সাম্‌নে গিয়ে ভজার সকল আশা-উৎসাহ জল হয়ে গেল। সারাপথ সে মনে মনে মহড়া দিতে দিতে গিয়েছে—সেখানে গিয়ে কি বলবে, কি ভাবে একটা ফল চাইবে; কিন্তু দোকান-দারের মুখের দিকে চেয়ে সে এমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল যে, তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হল না। বার-তুই দোকানের সম্মুখ দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বিষণ্ণমুখে বাসার দিকে ফিরতেই সে দেখল এক জুয়েলারী দোকানে রমাপতিবাবু কি একটা গয়না দেখছেন।

ভজার মনে আবার আশার আলো ফুটে উঠল। গত রবিবারে সে ত রমাপতিবাবুর বাসার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কাঙ্গালী-বিদায় করা দেখেছে। দয়ালু তিনি। তিনি কি তার মায়ের জন্য একটা ডালিম কিনে দেবেন না? ভজা

দোকানের সম্মুখে এগিয়ে গেল; দোকানের ভিতরে যাবার সাহস হ'ল না। ইতিমধ্যে রমাপতিবাবু মানিব্যাগের মধ্যে কি যেন পূরে তা পাঞ্জাবীর পাশের পকেটে রেখে বের হয়ে এলেন। ভজার কিছু বলা হ'ল না। সে একপাশে স'রে দাঁড়াল; তারপর তাঁর পিছনে পিছনে একটা বড় কাপড়ের দোকানে এসে উপস্থিত হ'ল।

বৃষ্টির দিন হ'লেও দোকানে ক্রেতার সংখ্যা কম নয়। রমাপতিবাবু একখানা লম্বা টেবিলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কতক-গুলো দামী রঙিন শাড়ী দেখ্‌তে লাগলেন। দোকানের একজন ভৃত্য তাড়াতাড়ি চেয়ার আনতে গেল। ভজা এবার রমাপতিবাবুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সে তাঁর কাছে কথা বলবার সাহস সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারে নি। সে ইতস্ততঃ করছে। এমন সময় দেখল মানিব্যাগটি রমাপতিবাবুর পকেটে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটু হাত বাড়ালেই অনায়াসে নেওয়া যায়। ভজা ভাবল—নিই না; আনা দুই পয়সা বের ক'রে নিয়ে আবার ঐ পকেটেই রেখে দেব। তার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করতে লাগল। তবু কোন রকমে পকেট থেকে মানিব্যাগটি তুলে নিয়ে সে দোকান থেকে স'রে পড়ল।

রাস্তায় এসে সে মানিব্যাগটি খুলে দেখে তার মধ্যে একটি আধুলি আর খানকতক নোট। আধুলিটা বের ক'রে নিয়ে সে মানিব্যাগটি তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে

ফেলল এবং এক দৌড়ে সেই ফলের দোকানে গিয়ে হাজির হ'ল।

একটা ডালিম ওজন ক'রে ফলওয়ালা বলল—"দশ পয়সা।"

ভজা আধুলিটা তার সাম্‌নে ফেলে দিলে দোকানী ডালিমটা আর ফেরৎ পয়সাগুলো ভজার হাতে দিল। তার হাত তখন থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিল। ভজার শুষ্ক মুখ আর শঙ্কিতভাবে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করা দেখে কাবুলী জিজ্ঞাসা করল—"কা হুয়া বাচ্চা?" ভজা তার কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুত সে-স্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল।

যখন সে বাসায় পৌঁছল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঘরে প্রদীপ জ্বেলে মাকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল—"মা, একটু ডালিমের রস ক'রে দি? খেলে শরীরটা ভাল লাগবে।"

মা চোখ মেলে বললেন—"উঃ! একটু জল দে বাবা। এতক্ষণ কোথায় ছিলি?"

—"বাজারে গিয়েছিলাম, ডালিম আনতে—"

—"ডালিম! কে দিল?"

—"কিনেছি।"

—"পয়সা কোথায় পেলি?"

ভজাকে নিরুত্তর দেখে মায়ের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল। তিনি ব্যাকুলস্বরে বললেন—"সত্যি ক'রে বল্ বাবা, কার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ডালিম কিনেছিস্।"

ভজার চোখ ছল্-ছল্ করতে লাগল। সে নীরবে শুধু মানিব্যাগটা মায়ের সাম্‌নে তুলে ধরল। তা দেখে তিনি অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন—"এ কি কাণ্ড তুই করলি ভজা, কার সর্ব্বনাশ ক'রে এই মানিব্যাগ নিয়ে এসেছিস্? আমার যে আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে ইচ্ছা করছে না!"

অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে ভজা বলল—"মাত্র দশ পয়সার ডালিম কিনেছি; আর সব ঠিকই আছে।"

মা বললেন—"যার কাছ থেকে নিয়েছিস্ তাকে তুই চিনিস্?"

—"হ্যাঁ। মুন্সেফবাবুর।"

গলার স্বরে অপূর্ব্ব কোমলতা মেখে মা দম নিয়ে বললেন—"মাণিক আমার, যাও ওগুলো তাঁকে দিয়ে এস গে। অন্যের জিনিস কি ওভাবে নিতে আছে? ছিঃ! ভগবান যে-ভাবে রাখেন, তাই ভাল। জিজ্ঞেস করলে সত্য কথা ব'লো, কেমন?"—তাঁর তুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ভজা আর কোন প্রতিবাদ করল না—শুধু কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে তু'চোখ ভাল ক'রে মুছে মানিব্যাগ ও ডালিমটা হাতে ক'রে ঘর থেকে বের হ'য়ে গেল। তুঃখে, অভিমানে তার বাক্‌রোধ হয়ে আসছে। অন্ধকারে একা একা পথ চলতে তার মনে হ'ল কোথাও গিয়ে নির্জ্জনে খুব খানিক কেঁদে বুকটা হাল্‌কা ক'রে নেয়। অদূরে বৈত্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত

এক দোতালা থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল। সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনা তাকে আরও ব্যথিত ক'রে তুলল—কেন, কেন এই আকাশ-পাতাল প্রভেদ! একজন অনাহারে, অচিকিৎসায় সামান্য একটু খাদ্যের জন্য ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরে, আর কতজন বিলাসের জন্য কত টাকা খরচ করে—কেমন হেসে খেলে দিন কাটায়! সমদর্শী ভগবানের রাজ্যে এই কি বিচার? তার মায়ের মত মা কয়জনের আছে? তবু তাঁর কি কষ্ট!—সে আর চিন্তা করতে পারে না। নির্ম্মম অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে ক্ষোভে-দুঃখে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠে।

—৩—

রমাপতিবাবুর বাসার কাছে গিয়ে ভজার আর পা উঠে না; সাহস হয় না যে বাসার ভিতর ঢোকে। বহুক্ষণ গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে কম্পিতপদে অন্ধকার বৈঠকখানা ঘরের স্ক্রীণ সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। ঢুকতেই হাতে ঠেকল টেবিল। তার উপর জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে অশান্ত হৃৎপিণ্ডটাকে শান্ত করবার জন্য দু'হাতে বুক চেপে ধ'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বের হয়ে আসতেই চেয়ারে ধাক্কা লেগে সশব্দে সে মেঝের উপর প'ড়ে গেল।

পাশের ঘর থেকে ভৃত্য রঘু ছুটে এসে সুইচ্‌ টিপে আলো জ্বালিয়েই চীৎকার ক'রে উঠল—"চোর চোর!"

রমাপতিবাবু এলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছেলে, মেয়ে, শ্যালক, গৃহিণী—

ততক্ষণ রঘু ভজার হাত ধ'রে দাঁড় করিয়েছে। একে সারাদিন অনাহার, তারপর এই অভাবনীয় পরিস্থিতিতে ভজার মুখ লজ্জায়, আশঙ্কায় একেবারে শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, দু'পা ঠক-ঠক ক'রে কাঁপছে ; মাথা তুলে কারও দিকে চাইবার শক্তি তার নেই।

রমাপতিবাবুকে দেখে রঘু ভজার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বিজয়গর্ব্বে বলল—"পাজীটা অন্ধকারে কোন খারাপ মতলব নিয়ে ঢুকেছিল।"

রমাপতিবাবু টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন ; মানিব্যাগের দিকে চোখ পড়তেই বললেন—"এ তো দেখছি আমারই মানিব্যাগ ! এ ডালিম আবার কে নিয়ে এল ?"—মানিব্যাগ খুলে দেখে, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন—"সবই দেখছি ঠিক আছে—কানবালা, টাকা—"

শ্যালক জগদীশবাবু টেবিলের উপর থেকে ডালিমটা তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"একেবারে কাঁচা চোর। পকেটমারাতে বোধ হয় এই প্রথম হাত-খেলানো। দেখুন না, হাকিমকে ঘুষ দেবার জন্য চোরাই মালের সঙ্গে একটা রসাল ডালিম পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছে ! এদিকে একহাত বুদ্ধি খেলিয়েছে বটে !"

মুন্সেফ-গৃহিণী বললেন—"ও হয়ত চুরি নাও করতে পারে। জিজ্ঞেসই কর না ব্যাপারটা কি!"

রমাপতিবাবু ভজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ মানিব্যাগ তুমি কোথায় পেলে? রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছ?"

ভজা নীরবে অধোমুখে থেকে শুধু মাথা নেড়ে অস্বীকার করল।

—"তবে কে তোমাকে দিল?"

—"আমিই নিয়েছিলাম।"

কথা ক'টি শুনেই জগদীশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—"বাপরে সাহস! লিলিপুট পিক্-পকেট, অর্থাৎ ক্ষুদে পকেটমার! বড় হ'লে দল সৃষ্টি করবে!"

গৃহিণী তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন—"তুই থাম না জগদীশ।" তার পর ভজাকে লক্ষ্য ক'রে সস্নেহে বললেন—"ডালিম কিনেছিলে কেন? আর এ টাকাগুলো ফেরৎ দিতেই বা এলে কেন? কি হয়েছে বল। তোমার কোন ভয় নেই।"

মুন্সেফ-গৃহিণীর কণ্ঠে স্নেহের আভাষ পেয়ে ভজার চোখে অশ্রুর বন্যা নেমে এল। তাঁর সহানুভূতিসূচক প্রশ্নে ভজা তার মায়ের অবস্থা এবং সকল কথা একে একে খুলে বলল।

সেই কাহিনী শুনে ঘরশুদ্ধ লোক ব্যথায় ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে রইল। কর্ত্রীঠাকরুণ ভজার জন্য খাবার আনালেন; কিন্তু ভজা তার মায়ের আগে কিছুতেই খেতে রাজী হ'ল না। অবশেষে রমাপতিবাবু জগদীশবাবু ও রঘুকে সঙ্গে নিয়ে ভজাদের বাসায় গেলেন।

ভজার মায়ের তখন অন্তিম অবস্থা। বাক্‌শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে; কিন্তু চোখ দুটি এত জীবন্ত যে, মনে হয় প্রাণ যেন সমস্ত দেহ ছেড়ে দুই চোখে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

রমাপতিবাবু তাড়াতাড়ি রঘুকে ডাক্তার ডাকতে পাঠালেন। ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন—"ডবল নিউমোনিয়া। 'টু লেট্'—এখন আর সময় নেই—"

ভজা তার মায়ের বুকের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মায়ের দুই চোখের কোণ বয়ে কয়েক ফোটা অশ্রু তাঁর শুষ্ক গণ্ডের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

দুঃখিনী জননীর মর্ম্মব্যথা উপলব্ধি ক'রে রমাপতিবাবু তাঁর কাছে ব'সে বললেন—"আপনি নিশ্চিন্ত হন। ভজা আমার কাছে থাকল। আপনার অভাবে ও নিতান্ত অসহায় হবে না।"

ভজার মা শেষবারের জন্য রমাপতিবাবুর দিকে চোখ মেলে তাকালেন। সে-দৃষ্টি আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরা। উদ্গত অশ্রু মুক্তাবিন্দুর আকারে বের হয়ে আসবার আগেই তাঁর চোখের পাতা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এল। ক্ষণিকের জন্য তাঁর মুখমণ্ডলে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্ত আভা ফুটে উঠল—সে প্রদীপ নিভে যাবার পূর্ব্বাভাষ। তারপর তিনি ধীরে ধীরে চির-নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

দাদা

পুকুরপারে প্রকাণ্ড এক কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় গ্রামের উচ্চ প্রাইমারী স্কুল। লাখ লাখ লাল ফুলে সমস্ত গাছ ভ'রে গেছে—যেন বৃদ্ধ বনস্পতি ফাল্গুনের হোলির দিনে মাথায় আবীর মেখে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিমুহূর্ত্তে ছুটি একটি ক'রে পাঁপড়ি খসে' খসে' পড়ছে নীচের সবুজ ঘাসের গালিচার উপর।

স্কুল তখনও বসে নি। কয়েকটি ছেলে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে উপরের দিকে ঢিল ছুড়ছিল—দেখি কার ঢিল কৃষ্ণচূড়া গাছের উপর দিয়ে পার হয়ে যায়। তিন-চারটি বালিকা একমনে ঝরা ফুলদলগুলো কুড়িয়ে আঁচলে ভ'রে নিতে ব্যস্ত। এমন সময় রাস্তার মোড়ে বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায়কে দেখা গেল। ছাত্রদল বাহুর পরীক্ষা আপাততঃ স্থগিত রেখে দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। মেয়েরা গেল তাদের পিছনে।

পণ্ডিত মশায় এসে বললেন—"আজ সংবাদ পেলাম—আগামী কাল সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবু আমাদের স্কুল দেখতে আসবেন। তোমরা সবাই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড় প'রে, পড়াশুনা ভাল ক'রে ঠিক ক'রে নিয়ে আসবে। তোমরা

যদি ভাল উত্তর দিতে পার, তিনি কত খুশী হবেন। আমাদের স্কুলেরও সুনাম হবে। ভয় কিচ্ছু পেয়ো না; তিনিও তোমাদেরই মত মানুষ—তোমাদেরই মত এক সময় ছোট ছিলেন—স্কুলে পড়েছেন।”…

কিন্তু পণ্ডিত মশায়ের অভয় ও উৎসাহের বাণী শোনান সত্ত্বেও ছাত্রদের অধিকাংশেরই মুখ শুকিয়ে উঠল। পাড়াগাঁয়ের স্কুল; কোট-প্যাণ্ট-পরা লোক দেখলে সবাই অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। তাতে আবার তিনি এসে পরীক্ষা করবেন! আগে থেকেই ছাত্রদের বুকের মধ্যে ঢিপ্-ঢিপ্ করতে লাগল।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ধরণী কিছু সাহসী। সে বলল—“ভয় কি পণ্ডিত মশায়! আমার মোটেই ভয় করে না। কয়বার সায়েব দেখলাম। মালঞ্চি ইষ্টিশানের কাছ দিয়ে আমার দিদির বাড়ী যাবার সময় কয়বার দেখলাম একেবারে শেষের গাড়ীতে একজন সায়েব দাঁড়িয়ে রয়েছেন—মাথায় কালো চিক্চিকে এক টুপী; কাঁধের উপর থেকে এই কোমর পর্য্যন্ত কেমন এক পট্টি; হাতে একখানা নীল নিশান।”

পণ্ডিত মশায় হেসে বললেন—“সে তো গার্ড সায়েব রে!”

সব ছাত্র এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে সপ্রশংস-দৃষ্টিতে ধরণীর দিকে চেয়ে তার বীরত্ব-কাহিনী শুনছিল। পণ্ডিত মশায়ের কথায় সে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল; পরমুহূর্ত্তেই বলল—“তা হোক্। স্কুলে এসে তো সায়েব আমাদের মারবেন না?”

—"না—না, মারবেন কেন ?" পণ্ডিত মশায়ের কথায় সবাই আশ্বস্ত হ'ল।

ধরণী বলল—"তবে আর কি ! তিনিও মানুষ ; আমরাও মানুষ। আজ আমাদের ছুটি দিন পণ্ডিত মশায়। ঘর সাজাতে হবে। ছাত্রীরা আনবে ফুলের মালা। ছোট মামার কাছে শুনেছি সহরের স্কুলে তা'রা নাকি খুব ভাল ক'রে ঘর-দোর সাজায়।"

কিছুক্ষণ পরে ছুটি পেয়ে ছাত্রেরা হৈ-চৈ করতে করতে বাড়ীর দিকে চলল। ধরণী তার সঙ্গীদের নিয়ে স্কুলঘর সাজানের কাজে লেগে গেল।

... ...

পরের দিন। সকালবেলা স্কুল। সব ছেলেমেয়ে পরিপাটি বেশভূষা প'রে এসেছে ! জানালা দিয়ে কতকগুলো কৌতূহলী চোখ—পরিদর্শকের আগমন প্রতীক্ষা ক'রে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হচ্ছে। এমন সময় তিনি এলেন। সঙ্গে কয়েকজন গ্রামস্থ ব্যক্তি। দেবদারুর পাতা দিয়ে স্কুলঘরের সাম্‌নে তোরণের মত ক'রে সাজান। মাঝখানে রঙিন কাগজের অক্ষরে বড় ক'রে লেখা—'স্বাগতম্—নমস্কার'।

পণ্ডিত মশায় এগিয়ে গিয়ে সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবুকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁরা ঘরে প্রবেশ করামাত্র সকলে একসঙ্গে নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জ্ঞাপন করল। নাটকের প্রথম অঙ্ক

আরম্ভ হবার সময় ড্রপ-সীন্ উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন দর্শকের সাগ্রহ-দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের উপর নিবদ্ধ হয়, তেমনি সকলের চোখ গিয়ে পড়ল নবাগতের উপর। টুপী খুলে তিনি তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন ; হাসিমুখে বললেন—"বেশ, বস।"

সবাই ব'সে পড়ল। তিনিও একখানি চেয়ারে বসলেন। সমস্ত ঘরময় উৎকণ্ঠিত নীরবতা। টেবিলের উপর ফুলদানিতে কিছু সুগন্ধি ফুল পাতাবাহারের চিকণ পাতার ফাঁকে ফাঁকে বসান। টেবিলের মাঝখানে দু'টি বকুলমালা—গন্ধে ঘরখানি আমোদিত।

ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণ-কার্য্য আরম্ভ হ'ল। তৃতীয় শ্রেণীতে দশ-বারো জন ছাত্র-ছাত্রী। তাদের সাম্‌নে গিয়ে পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা কেউ একটা কবিতা আবৃত্তি করতে পার ?—যে-কোন একটা ভাল কবিতা।"

সকলেই সাম্‌নের দিকে হাত প্রসারিত ক'রে দিল। তাদের মধ্যে সাত-আট বছরের একটি শ্যামা বালিকা। তার পরণে একখানা ফিকে গোলাপী রঙের ছাপানো শাড়ী ; আঁচলখানি ঘোমটার মত ক'রে মাথার উপর দেওয়া। বর্ষার দিনে নবোদ্গত পল্লবের মত তার মুখখানি স্নিগ্ধ-কোমল লাবণ্যে ভরা। চিকণ টানা-টানা ভ্রূ, দীর্ঘ পক্ষ্ম, নিবিড় আয়ত চক্ষু—সব মিলে যেন একখানা ছবির মত।

ইন্‌স্পেক্টার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি নাম তোমার খুকু ?"
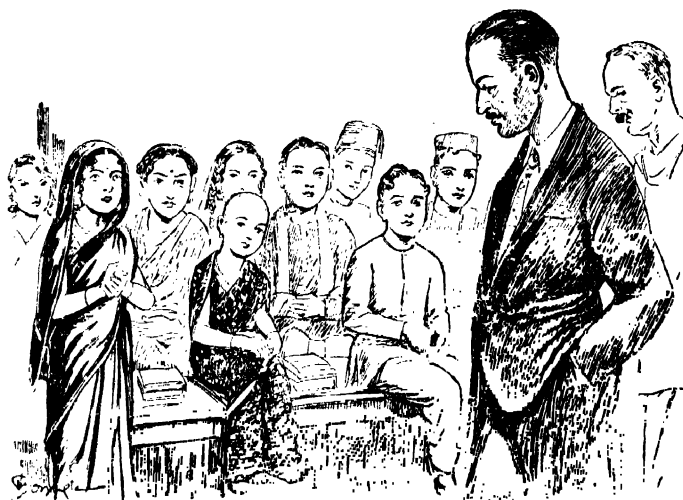
সে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল। পণ্ডিত মশায় বললেন—"লজ্জা কি ? বল। নাম ব'লে একটা কবিতা আবৃত্তি কর।"

বালিকা বিনীতভাবে বলল—"রাবেয়া।"

ওস্তাদের নিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে সেতারের মধ্য থেকে যেন একটা সুর স্পষ্ট কথা হয়ে বের হ'ল—'রাবেয়া'! এমনই মিষ্টি তার কণ্ঠ।

বালিকার দাঁতগুলো কচি ভুট্টার কোমল দানার মত স্বচ্ছ। কথা বলবার সময় দ্বিতীয়ার ক্ষীণ শশিকলার মত একটুখানি শুভ্রতার আভা তার পাতলা ঠোঁটের উপর দিয়ে খেলে যায়।

ইন্‌স্পেক্টার বললেন—“চমৎকার নাম। একটা আবৃত্তি শোনাও তো দেখি।”

রাবেয়া একটু ইতস্ততঃ করার পর মধুরকণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল—

“ডেকে দাও, ডেকে দাও
দাদারে আমার,
একা আমি পারি না খেলিতে।
আইল নিদাঘ, লয়ে
ফলফুল-ভার,
দাদা মোর গেল কোন্ পথে?
ফেলে কি পালাল দাদা
তার প্রিয়পাখী,
তার মৃগ, তার তরুলতা?
সারাটি দিবস আমি
কেঁদে কেঁদে ডাকি
তবু দাদা ক'বে না কি কথা?
খেলিয়াছি কত খেলা
গলায় গলায়
সে খেলা কি মোর ফুরাইল?
যখন আছিল দাদা
কেন তারে হায়
আরো আমি বাসি নাই ভাল?”

আবৃত্তি করতে করতে রাবেয়ার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। তার হৃদয়ের কোন্ কোমল তন্ত্রীতে যেন আঘাত পড়েছে। চোখে জল ছাপিয়ে উঠল। "কেন তারে হায় আরো আমি বাসি নাই ভাল?"—বলতে বলতে সে আর সামলাতে পারল না। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মাথা নীচু করে সে নীরব হ'ল! কয়েক ফোটা অশ্রু টস্-টস্ ক'রে মেঝের উপর পড়ল।

পণ্ডিত মশায়ের চোখও ভিজে উঠেছে। পরিদর্শক তাঁর দিকে প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইতেই তিনি বললেন—"ওর দাদার কথা মনে পড়েছে, স্যার। সে এক ভারী করুণ ব্যাপার। দুই জনের প্রায় একই রকম চেহারা; একই সঙ্গে পড়ত। ভাই-বোনের মধ্যে ঐ রকম মিল বড় দেখা যায় না। ছেলেটি পড়াশুনায় ছিল চমৎকার। এই দিন পনের হ'ল গাছ থেকে প'ড়ে সে মারা গেছে। এখন ও একা—বাড়ীতে ভাই বোন আর কেউ নেই।"...

রাবেয়ার সেদিনের কথা মনে পড়ল। বিকালে তার দাদার সঙ্গে বৈঁচিফুলের বাগানের মধ্যে প্রজাপতি ধরতে গেছে। একটা শ্বেত রঙ্গনের গাছে অসংখ্য ফুল ধরেছে। তার মধু খেতে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতীয় প্রজাপতি আসে। কেমন সুন্দর রঙিন পাখা নেড়ে নেড়ে দুলে দুলে চলে! তা'রাও যদি ঐ রকম উড়তে পারত! তার দাদা বলে—

'ভারী মজা হ'ত তা হ'লে। মা চেয়ে চেয়ে দেখত আমরা বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি!"

কাছেই একটা গোলাচিগাছে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। ঈষৎ হরিদ্রাভ ফুল; বেশ মিষ্টি গন্ধ। রাবেয়া বলল—'দাদা, এই ফুলে বেশ মালা হয় কিন্তু।'

—'আচ্ছা দাঁড়া; আমি পেড়ে দিচ্ছি। তুই নীচে থেকে কুড়াবি।'

সেলিম গাছে উঠে পড়ল। ফুলে রাবেয়ার আঁচল প্রায় ভ'রে এসেছে। সেলিম বলল—'ঐ দেখ রাবি, কেমন সুন্দর একটা থোকা। পাতাসুদ্ধ এটা ভেঙ্গে আনব। মাথায় পরলে তোকে বেশ দেখাবে!'

—'অত আগায় যাস নে, দাদা। প'ড়ে যাবি। আর দরকার নেই—নেমে আয়—'

কথা শেষ হবার আগেই গাছের কোমল শাখা ভেঙ্গে সেলিম প'ড়ে গেল। বুকে আঘাত লাগায় আর কথা বলতে পারল না। রাবেয়ার দিকে একবার চেয়ে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করল। রাবেয়া চীৎকার ক'রে উঠল। * * * আর সে চিন্তা করতে পারে না। ভারী অসহায় বোধ হয় তার। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ভাইএর মুখখানি তার চোখের উপর ভাসতে থাকে।

সাব-ইন্‌স্পেক্টার সাহেব সস্নেহে রাবেয়ার মাথায় হাত

বুলিয়ে দিয়ে বললেন—"কেঁদো না রাবেয়া। এই জগতে কোন জিনিসই একেবারে হারিয়ে যায় না। তোমার দাদাকে এখন দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু সে তো একেবারে হারিয়ে যায় নি। আবার তার সঙ্গে দেখা হবে। এক ইংরাজ বালিকার ছয় ভাই-বোন ছিল। তাকে নিয়ে সাতজন। তাদের মধ্যে কেউ থাকত বিদেশে; আর কয়েকজন মারা গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে সে বলত—'আমরা সাত ভাই-বোন। কয়েকজন আছে দূর দেশে, আর দু'জন মাটির নীচে ঘুমাচ্ছে। একদিন আমরা সবাই একত্র হব।'" ... ...

স্কুল দেখা শেষ হ'ল। পরিদর্শক সব ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে হাতে কিছুটা ক'রে লজেঞ্জ দিলেন। ছেলেদের কাছে এ এক নূতন জিনিস। কোনটায় একটু আনারসের আস্বাদ, কোনটায় কাঁচা আমের, কোনটায় কলা বা কমলালেবুর। সবাই আনন্দ করতে করতে বাড়ীর দিকে চলল। রাবেয়ার লজেঞ্জ কয়েকটা সে আঁচলের প্রান্তে বেঁধে রেখে দিল। পথে যেতে যেতে মণ্টু বলল—"আমারটা খেতে কাঁচা আমের স্বাদ লাগছে। তোরটা কেমন, রাবেয়া?"

—"আমি এখনও খাই নি।"

—"কেন? একটা দেব? আমার কিন্তু এখনও তিনটা আছে। এই দেখ—"

—"না। এখন না। বাড়ী গিয়েই খাব।"...

যে যার পথে চ'লে গেল।

সবাই ফিরেছে, কিন্তু রাবেয়ার দেখা নেই। তার মা এঘর-ওঘর খুঁজে দেখলেন। কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। অগত্যা তিনি পাশে লতিফাদের বাড়ীতে সন্ধান নিতে গেলেন। লতিফা ঐ স্কুলেই পড়ে। সে বলল—"রাবেয়া তো আমাদের সঙ্গেই এসেছে। সে লজেঞ্জ খায় নি; কাপড়ে বেঁধে এনেছে। সায়েব তাকে কত আদর ক'রে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল—আরও কত কী বলল।"

তাঁর আদরের মেয়েকে একজন মস্ত বড় লোক স্নেহ দেখিয়েছেন শুনে মাতৃহৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। কৃতজ্ঞচিত্তে নীরবে তিনি সেই অজানা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন।

মা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলেন। মেয়েকে বেশীক্ষণ না দেখে তিনি থাকতে পারেন না। শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়াল দেখলেন—কোথাও নেই। গেলই বা কোথায়!

রান্নাঘরের পিছনে বেগুন-পালান। গাছগুলো বুড়ো হয়ে এসেছে। তখনও দু'একটা ক'রে বেগুন ফলছে। বাগানের একপাশে একটা সজনে গাছ। তার নীচে তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে লেপা সেলিমের কবর। কবরের মাথার দিকে রাবেয়া একটা গোলাচি ফুলের ডাল পুতে দিয়েছে। ফুল হ'লে ঝরে' ঝরে' কবরের উপর পুষ্পার্ঘ্য পড়বে। রাবেয়ার মা

নিঃশব্দে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি সেখানে ব'সে সেলিমের আত্মার কল্যাণ কামনা করেন; পুত্রশোকার্ত্ত মাতার তপ্ত অশ্রুতে কবর প্রতিদিন অভিষিক্ত হয়।

তিনি দেখলেন—রাবেয়া কবরের পাশে চুপ ক'রে ব'সে একদৃষ্টে কবরের দিকে চেয়ে আছে। সম্মুখে মাটির উপর

কয়েকটি লজেঞ্জ। সে এত তন্ময় যে তার মায়ের আগমন বুঝতেই পারে নি।

একটুকুও ভাল জিনিস সে কোনদিন দাদাকে না দিয়ে খেতে পারে নি। আজ কেমন ক'রে নূতন একটা সামগ্রী সে একা একাই খাবে! তাই তা দাদার কাছে নিয়ে এসে চুপ ক'রে ব'সে আছে। জগতে তো কিছুই হারায় না।

তবে তার দাদাকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে না? সে ইচ্ছা করলেই তো চ'লে আসতে পারে। রাবেয়ার কথা কি সে একেবারে ভুলে যেতে পারে? তবে কেনই বা সে এতদিন মাকে না দেখে চুপ ক'রে রয়েছে! সরল বালিকা নিজের মনে এ প্রশ্নের সমাধান করতে পারে না।

মা আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না—রাবেয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে আকুল উচ্ছ্বাসে সেলিমের কবরের উপর লুটিয়ে পড়লেন।

কাপালিক

সবেমাত্র নূতন থানায় অফিসার-ইন্-চার্জ্জ হয়ে এসেছি। এসেই এক ফ্যাসাদ। একদিন টেলিগ্রাম এল—কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে এক পাড়াগাঁয়ে ভীষণ ডাকাতি হয়ে গেছে। অবিলম্বে সেখানে তদন্তে যেতে হবে।

গরুর গাড়ী কিংবা ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন যানবাহন নেই। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘের ঘনঘটা; রাস্তাঘাট পঙ্কিল ও অপরিচিত। ঘোড়া নিয়ে বের হ'তেও সাহস হ'ল না। অগত্যা ভবতারণকে ডাকা হ'ল। বৃদ্ধ বাগ্দী গাড়োয়ান। নাম তার দীনু, না ঐ রকম একটা কিছু। সময়ে অসময়ে তার গাড়ীতে চ'ড়ে এদিক-ওদিক পাড়ি দিতে হয়, এজন্য দারোগাবাবুরা তার নাম দিয়েছেন 'ভবতারণ'। সমস্ত থানার অলিগলি ভবতারণের নখদর্পণে।

সন্ধ্যার আগে ভবতারণ এবং তার ছেলে দু'জনে দু'খানা গাড়ী নিয়ে এসে হাজির। আমরা প্রস্তুত হয়ে উঠে বসলাম বৃদ্ধের গাড়ীতে আমি, অন্যখানায় দু'জন বন্দুকধারী সেপাই। ডাকাত ধরতে চলেছি—কখন কি হয় বলা যায় না। তাই আমার রিভলভারটিও সঙ্গে নিলাম।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধ'রে চলেছি। গাড়ীর চাকার

একটানা ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ শব্দ। পথের দু'ধারে নিবিড় জঙ্গল। লোকালয় একরকম নেই বললেই চলে। প্রায়ই চোখে পড়ে বড় বড় শালগাছ সর্ব্বদেহে মুকুলের প্রাচুর্য্যে অবনত হয়ে যেন পথিককে স্পর্শ ক'রে শ্রদ্ধা জানাতে চায়। আশেপাশের ঝোপের উপর দিয়ে আলোকলতা সোনার জাল বুনে চলেছে। মাঝে দু'একটা শিয়াল একান্ত নির্ভয়ে আমাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে পথ পার হয়ে গেল। তাদের নিঃশঙ্ক গতিবিধি দেখে মনে হয়—এ যেন তাদেরই রাজ্য; মানুষকে তা'রা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে এল। আশেপাশের ঝোপেঝাড়ে ও গাছের মাথায় মাথায় হাজার হাজার জোনাকি সঞ্চরমান হীরার টুকরার মত জ্বলতে লাগল। এ বুঝি বনানীর দীপালি উৎসব।

গাড়োয়ানকে বললাম—"ভবতারণ, চারদিকে যে রকম গভীর জঙ্গল দেখি, এখানে বোধ হয় আগেকার দিনে ডাকাতদের আড্ডা ছিল?"

—"তা সত্যি দারোগাবাবু, এই সব জঙ্গলে এখনও অনেক পুরাণো কালীমন্দির আছে। ডাকাতেরা নাকি মা চামুণ্ডার পূজা দিয়ে তাঁর হাত বেঁধে রেখে ডাকাতি করতে বেরুত। আবার ফিরে এসে সেই বাঁধন খুলে দিত।"

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম—"মায়ের হাতে বাঁধন কেন?"

বৃদ্ধও হেসে উত্তর দিল—"বুঝলেন না? হাত বেঁধে রেখে যেত যাতে তাদের ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ডাকাতি করা—প্রাণ নিয়ে খেলা তো! কিন্তু ডাকাতদের চেয়ে এ জঙ্গলে বেশী ভয় ছিল কাপালিক সন্ন্যাসীর। তা'রা মানুষ ধ'রে এনে পূজা ক'রে কালীর কাছে বলি দিত।"

—"তোমার বয়স তো অনেক হয়েছে বুড়ার পো, তুমি কাপালিকদের সম্বন্ধে কোন ঘটনা জান নাকি?"

—"না বাবু, আমি নিজে দেখি নি। তবে ঠাকুরদার মুখে অনেক কথাই শুনেছি। এই দেখবেন, আর কিছুটা পথ গেলে বাঁ-দিকে জঙ্গলের মধ্যে বটগাছতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন। সেখানে যে কত মানুষের গর্দ্দান কাটা গেছে! এক কাপালিক তো পাগলই হয়ে গেল।"

—"কি রকম বল তো শুনি"—উৎসাহে আমি সোজা হয়ে বসলাম।

বৃদ্ধ বলল—"সে-সব কথা বলতে গা এখনও ছম্‌ছম্ করে বাবু। সাধু-সন্ন্যাসীর ব্যাপার!"

—"তাতে কি? আচ্ছা, চলো সেই বটগাছের নীচে ব'সেই তোমার কাহিনী শুনব। স্থানটিও দেখা হবে।"...

বহুক্ষণ উভয়েই নীরব। ভবতারণ বোধ হয় পুরাণো স্মৃতির পাতায় মনে মনে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। বনের

মধ্যে ঝিঁঝিপোকার ঝঙ্কার আর ভেকের অর্গ্যান-সুর মিলে অপূর্ব্ব সান্ধ্যতান উঠেছে। আমার মনও চ'লে গেছে কাপালিকদের যুগে। হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে বৃদ্ধ দ্বিধাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করল—"বাবু, সত্যিই কি তা হ'লে কাপালিকের আসনে যাবেন?"

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়। এসে পড়েছি নাকি?"

"এখানে নেমে হেঁটে যেতে হবে বাবু",—ব'লে ভবতারণ গাড়ী থামিয়ে ফেলল। পিছনের গাড়ীও এসে থামল।

ভবতারণের ছেলে ও একজন সেপাইকে সেখানে রেখে লণ্ঠন, টর্চ্চ, বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে আমরা তিনজন জঙ্গলের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথের কাঁটা, লতাপাতা সরিয়ে বটগাছের দিকে অগ্রসর হলাম।

কিছুটা পথ গিয়েই এক বিরাট বটগাছের তলায় পৌঁছলাম। বটের ডাল থেকে মোটা মোটা শিকড় মাটি পর্য্যন্ত নেমে এসে থামের মত দাঁড়িয়ে আছে। তাদের উপর ভর দিয়েই বৃদ্ধ বনস্পতি যেন শত শত বৎসরের অতীত কাহিনীর স্মৃতি বুকে নিয়ে স্তব্ধ মৌনতার মধ্যে বিরাজ করছে!

প্রথমেই বিস্মিত হলাম গাছের তলা পরিষ্কার তকতকে দেখে। বোধ হ'ল যে কে যেন আমাদের আসবার ঠিক আগেই ঝাঁট দিয়ে চ'লে গেছে। কাপালিক এখনও আছে নাকি! বুকের মধ্যে ধড়াস্ ক'রে উঠল। টর্চ্চ ফেলে এগিয়ে গেলাম।

বটবৃক্ষের পাদদেশে একটি বেদীর উপর কালো পাথরের ছোট একখানি কালী-প্রতিমা। মূর্ত্তির সম্মুখে কয়েকটি নরমুণ্ড মাটিতে অর্দ্ধপ্রোথিত। বিগ্রহের লেলিহান জিহ্বাটি ভেঙ্গে গেছে। নীরব প্রতিমা তিন-চোখে একদৃষ্টে নরকপাল-গুলোর দিকে যুগের পর যুগ ধ'রে চেয়ে রয়েছেন।

ভবতারণ এবং সেপাই শিবধারী দূর থেকে প্রণাম ক'রে সম্ভ্রমভরে দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বললাম—"কি ভবতারণ, কোথাও ব'সে এখন তোমার গল্পটি শোনা যাক!"

তাড়াতাড়ি অস্বীকার ক'রে সে বলল—"না হুজুর, এখানে আর দেরী করব না। জায়গা দেখা হয়ে গেল; এখন চলুন, গাড়ীতে ব'সে গল্প শুনবেন। পথও খাটো হয়ে আসবে।"

সাহাসী শিবধারী সিংও সেই রহস্যময় কাপালিকের পীঠস্থানে বেশীক্ষণ থাকতে সাহস পেল না। ফিরে এসে আমরা আবার চলতে সুরু করলাম। কাপালিকের কাহিনীও আরম্ভ হ'ল।

"বহুদিন আগেকার কথা। সেপাইদের সঙ্গে ইংরাজদের যে লড়াই হয়েছিল, তার কিছুদিন পরে ফাল্গুন কি চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় একটি চৌদ্দ-পনরো বৎসরের বলিষ্ঠ কিশোর বালক একাকী এই পথ দিয়ে দ্রুত চলেছে। শ্রীমন্তপুরের রামকিঙ্কর অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র সে। বহুদিন বাড়ীর কোন সংবাদ না পেয়ে উতলা হৃদয়ে সে তা'র মায়ের চরণ

দর্শনে ছুটে চলেছে। জানে পথে সন্ন্যাসীর ভয় আছে, কিন্তু মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় পথের বিপদকে সে আমল দেয়নি। আর-কিছুটা পথ এগিয়ে যেতে পারলেই কোন বাড়ীতে রাত্রিবাস ক'রে পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী পৌঁছতে পারবে।

"সুদর্শন, সুগঠিতদেহ বালক ; হাতে দীর্ঘ যষ্টি। পথশ্রমে সুগৌর সুশ্রী মুখ আরক্তিম হয়ে উঠেছে। তা'র নিবিড় আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। কিন্তু পথ এবং পথের দৃশ্য ছেড়ে তার মন চ'লে গেছে গৃহের স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে। বাবার কথা ভাল ক'রে মনে পড়ে না। তাঁর চেহারাটিও স্পষ্ট স্মরণে আসে না। প্রায় এক যুগ আগের ছোট্ট একটু ঘটনা স্বপ্নের মত মনে হয়।—উঁচু বারান্দা থেকে একখানা ভাঙ্গা টিনের উপর প'ড়ে গিয়ে তা'র ঘাড়ের কাছে অনেকটা কেটে গিয়েছিল। যন্ত্রণায় রাত্রে ঘুমুতে পারত না। বাবা তাকে বুকে ক'রে সারারাত ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়াতেন। অতি অস্পষ্ট এই স্নেহস্পর্শের রেশটুকু ছাড়া তা'র পিতার স্মৃতি আর কিছু নেই। চোখে তা'র জল ভ'রে আসে। পরক্ষণেই নয়ন-সমক্ষে ভেসে উঠে মায়ের প্রশান্ত মমতাময়ী সৌম্য মূর্ত্তি। বরাভয়দায়িনী সর্ব্বদুঃখহরা জগন্মাতা ভবানীর যে অপার্থিব গরিমাময়ী মূর্ত্তি—তা'র মায়ের মধ্যেও যেন তাঁরই প্রতিচ্ছবি। সম্ভ্রমে সে মায়ের

চরণের উদ্দেশে প্রণাম করে। তা'র প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডলে একটা স্থির প্রতিজ্ঞার আভা ফুটে উঠে।—মাকে সে সুখী করবে—মায়ের সকল দুঃখ সে নিজের অন্তর দিয়ে মুছে দেবে—নিজের জীবনকে সুগন্ধি পুষ্পের মত বিকশিত ক'রে তুলে স্নেহময়ী চিরদুঃখিনী জননীর চরণতলে সে দেবে পুষ্পার্ঘ্য—মা—মা—

"সহসা তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। বনের মধ্যে নিরুপায় অনাথের বুকভাঙ্গা আকুল ক্রন্দন। সঙ্গে সঙ্গে তা'কে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য নির্ম্মম কণ্ঠের চাপা গর্জ্জন কেঁপে কেঁপে উঠছে! পথিক কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল! নিশ্চয় কেউ বিপন্ন হয়েছে; কি করা যায়? আবার কাতর আর্ত্তনাদ! সে আর স্থির থাকতে পারল না। লাঠিখানা শক্ত ক'রে ধ'রে দৃঢ়পদক্ষেপে সে বনের মধ্যে শব্দ লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হ'ল।

"কিছুদূর গিয়েই দেখল সেই কাপালিকের আশ্রম। পূজার আয়োজন করা হয়েছে। কালীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রোথিত যূপকাষ্ঠের সঙ্গে শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা একটি বালক। বিগ্রহের পিছনে বটগাছের সঙ্গে হেলান-দেওয়া একখানি উজ্জ্বল খড়্গ। যজ্ঞের জন্য যে আগুন জ্বালান হয়েছে, তার কম্পমান আভা খড়্গখানির উপর প্রতিফলিত হওয়ায় সেখানা মৃত্যুর করাল দন্তবিকাশের মত ঝিক্‌ঝিক্‌ ক'রে উঠছে। ঐ খড়্গের দিকে

চেয়েই লতাবদ্ধ বালক ক্ষণে ক্ষণে ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে আবার চোখ বুঁজে কম্পিতদেহে এলিয়ে পড়ছে।

"নবাগত নিঃশব্দে গিয়ে বালকটির মাথায় হাত রাখতেই, সে চম্‌কে উঠে অপলক-দৃষ্টিতে তা'র দিকে চেয়ে রইল। বালকের শান্ত করুণামাখা মুখ দেখে তা'র বোধ হয় আশা হ'ল—কোন দেবতা বুঝি তা'কে বাঁচাতে এসেছে। কাতর মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে কেবল দুটি কথা সে উচ্চারণ করল—'আমায় বাঁচাও ভাই!'

"প্রার্থনার স্বর শুনে কাপালিক ও তাঁর শিষ্যগণ পিছন ফিরে বিস্মিত হয়ে দেখেন, এক সুশ্রী বালক বলির জন্য ধৃত বালকটির মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কাপালিক গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—'কস্ত্বং বালক ?—কে তুমি ?'

"কোমল মধুর কণ্ঠে উত্তর হ'ল—'আজকের এই পূজায় আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে এসেছি। ভীত অনিচ্ছুক মানব-সন্তান তো জগন্মাতার বলির উপযুক্ত নয়! স্বেচ্ছায় আমি এসেছি এবং সানন্দেই আমার জীবন দান করব। এ বালকটিকে দয়া ক'রে মুক্ত ক'রে দিন্।'

"কাপালিক বালকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বললেন,—'উত্তম।'

"পরে শিষ্যদের দিকে ফিরে স্মিতহাস্যে বললেন—'বেশ সুলক্ষণযুক্ত বলি পাওয়া গেছে: মা নিজেই জুটিয়ে দিয়েছেন

বালকটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে

—মা—তারা—তারা—হ্যাঁ, ঐ ভীত অপদার্থটাকে ছেড়ে দিয়ে এটিকে স্নান করিয়ে নিয়ে এস।'

"বন্ধনমুক্ত হবার পর বালকটি প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বিহ্বল চোখ মেলে ব'সে রইল। তা'র আর চলবার শক্তি ছিল না।

"শিষ্যদের সঙ্গে গিয়ে পুকুর থেকে স্নান ক'রে এসে নবাগত বালকটি কাপালিকদত্ত একখানা রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে বেদীর নিকট গিয়ে জানু পেতে বসল। কাপালিক নিজ হাতে তা'র কপালে সিন্দুর ও রক্তচন্দনের তিলক এঁকে দিলেন। তারপর বেলপাতা ও জবাফুলে-গাঁথা একটি মালা তা'র গলায় পরিয়ে দিলেন। দিতেই বালকের কাঁধে কাটার চিহ্ন দেখে নির্ম্মম কাপালিকও যেন শিউরে উঠলেন। কম্পিত হস্তে সেই ক্ষত চিহ্নের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগলেন। বালকের আশঙ্কা হ'ল ক্ষতচিহ্ন আছে ব'লে কাপালিক বুঝি তা'কে প্রত্যাখ্যান করবেন। সে বলল—'ও কিছু নয় ঠাকুর! ছোট সময়ে পড়ে গিয়েছিলাম; তাই একটু কেটে গিয়েছিল। ওর জন্য আমার দেহের বলি অশুদ্ধ হবে না।'

"কম্পিতকণ্ঠে কাপালিক জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার নাম কি বৎস?—চণ্ডীপ্রসাদ?'

"চণ্ডীপ্রসাদ মুখ তুলে তাকাল। দেখে, কাপালিকের চোখে জল। সে অবাক্ হয়ে গেল। কাপালিকের চোখ অশ্রুপূর্ণ দেখবার কল্পনা সে কখনও করেনি।

"আবার অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল—'তোমার নিবাস ?—শ্রীনগর ?'

"চণ্ডীপ্রসাদ এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। কাপালিক আবেগভরে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগলেন—'বাবা, বাবা চণ্ডীপ্রসাদ ! তুই—তুই আমার সেই চণ্ডীপ্রসাদ ! তুই এত সুন্দর, এত মহানুভব ! আর তোর পিতা আমি শত শত জনকের নয়নের মণি পুত্রকে ঐ রাক্ষসীর পায়ে বলি দিয়েছি—'

"উত্তেজনায় কাপালিকের সর্ব্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সহসা বিস্ময়-বিমূঢ় পুত্রকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে কাপালিক কালীমূর্ত্তির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন—'রাক্ষসী—রাক্ষসী ! এত রক্ত পান ক'রেও তোর রক্ত-পিপাসা মিটল না। শেষে আমার সন্তানের উষ্ণরক্তে তুই স্নান করবি ? অন্যের ছেলে তোকে খাইয়েছি—এখন খাবি আমার ছেলে ?—হাঃ—হাঃ—হাঃ ! খা—খা—রক্ত খা—আমারই রক্ত খা—'

"বল্‌তে বল্‌তে ক্ষিপ্রগতিতে কাপালিক খড়্গ তুলে নিলেন এবং কালীমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়ে এক কোপে তাঁর নিজের বাম হাতের কব্জী কেটে ফেলে বিগ্রহের দিকে হাত প্রসারিত ক'রে দিলেন। তীরবেগে রক্তধারা ছুটে কালীর অঙ্গ ভাসিয়ে দিল। শিষ্যগণ হাহাকার ক'রে উঠল। কিন্তু কাছে এগোবে কে ?

উন্মাদ কাপালিক হাতের খড়্গ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অট্টহাসি হাসতে হাসতে ঝড়ের বেগে অন্ধকার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দূরে বহুদূরে বনান্তরালে সে অট্টহাসি মিলিয়ে গেল!

"ভীতি-বিহ্বল দর্শকগণ রক্তস্নাত কালিকার সম্মুখস্থ খণ্ডিত কত্তীখানার দিকে চেয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!"

পাঙ্খা-পুলার

স্কুলে তু'বেলা পরীক্ষা। ভীষণ গুমোট গরম। কোথাও একটু বাতাস নেই। স্কুলের বাগানের পাশে ঐ যে বড় বড় ঝাউ, ইউক্যালিপ্‌টাস্ আর দেবদারুগাছ—রাজবাড়ীর বিশাল প্রহরীর মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের একটা পাতাতেও কাঁপন লাগছে না। তাদের নূতন বের-হওয়া কোমল পাতাগুলো আগুনের হল্‌কার মত দারুণ রোদে ঝল্‌সে উঠেছে। ওদের দিকে তাকালে রৌদ্রক্লান্ত ফুট্‌ফুটে শিশুর কচি মুখ মনে প'ড়ে মায়া হয়।

এদিকে যে ছেলেরা ঘরের মধ্যে পরীক্ষা দিতে বসেছে, তাদের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। শরীরের রক্ত জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ যেন মুখ বন্ধ-করা ডেকৃচিতে মাংস সিদ্ধ করবার ব্যবস্থা! সব ঘরেই গেলাসের পর গেলাস জলের চাহিদা আর পাঙ্খা-পুলারকে আরও জোরে পাখা টানবার তাগিদ!

ক্লাস সেভেন-'বি' রুমের ছেলেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাদের ঘরের পাঙ্খা-পুলার হয়েছে দশ-এগারো বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছেলে। তু'বেলা পেট ভ'রে খেতে না পেয়ে তা'র শরীর হয়েছে কৃশ, মুখ অস্বাভাবিক রকম শুক্‌নো।

পাখার দড়ি টানার সঙ্গে সঙ্গে যে তা'র হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়, তা দূর থেকে স্পষ্ট দেখাই যায়। খাঁচায় ভরা অশান্ত পাখীর মত তা'র হৃৎপিণ্ড বুকের পাঁজরের উপরকার চামড়ার পর্দাটা ক্রমাগত ঠেলতে থাকে—যেন বেরুতে চায়! এই রকম যার স্বাস্থ্য—তা'র দু' চোখের পাতা ভারী হয়ে কেবলই জড়িয়ে আসছে। এক একবার ধমক খেয়ে সে সজাগ হয়ে উঠে, দু'চার মিনিট বেশ জোরেই টানে, কিন্তু সে আর কতক্ষণ। আবার ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে আসতে আসতে পাখা একেবারেই থেমে যায়।

এই সংবাদ শেষে গিয়ে পৌঁছল কেরাণী সাহেবের কাছে। তিনি ছুটে এলেন অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে। ঘুমে কেবল ছোকরাটার মাথা ঢুলে আসছে, ঠিক তেমন সময় কেরাণী সাহেবের কর্কশ কণ্ঠের ধমকে সে একেবারে চম্‌কে সোজা হয়ে জোরে পাখা টানতে লাগল। কেরাণী সাহেব বিকৃত-কণ্ঠে ব্যঙ্গ ক'রে বললেন—"ওঃ! নবাবপুত্তুর আমার, এখানে ঘুমোতে এসেছেন! একটা বালিশ আনতে পারনি?—ফের যদি পাখায় টান কম পড়ে তো ঘাড় ধ'রে বিদায় ক'রে দেব; আর একটাকা করব জরিমানা। নচ্ছারটা দিনে ঘুমোবে আর রাত্তিরে বের হবে সিঁধকাঠি নিয়ে!"

কেরাণী সাহেব চ'লে গেলেন। সমস্ত গালাগালি নীরবে সহ্য ক'রে ভেলু পাখা টানতে লাগ্‌ল। শুধু দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু

তা'র বুকের উপর টস্-টস্ ক'রে গড়িয়ে পড়ল। বাঁ-হাতের কব্জি দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ ও বুক মুছে ফেলে সে সেই ভারী পাখা একঘেয়ে টেনেই চলল।

এই অপটুদেহ দুর্ব্বল কিশোর বালকের দেহ-মনের উপর দুই শক্তির দ্বন্দ্ব চলছিল। একদিকে অপমান ও শাস্তির ভয়

তা'র দেহকে সক্রিয় রাখবার চেষ্টা করে, আর একদিকে অনিদ্রার ক্লান্তি তা'র চোখে ঘুমের স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে, তা'র মায়ামন্ত্রে জগৎ ভুলিয়ে দিতে চায়। অবশেষে এই রূপার কাঠির যাদু তা'কে অভিভূত ক'রে ফেলল। অপমানের তীব্র জ্বালা, রুদ্ধ অভিমানের দাহ, হৃদয়ের গোপন ব্যথা, সব ভুলিয়ে দিয়ে

মায়া-কাজল নিয়ে আবার ঘুম তা'র চোখে নামল—পাখা আবার ক্রমে মন্দগতি হয়ে আসতে লাগল।

এমন সময় ক্লাস সিক্সের ফার্ষ্ট বয় অমিতাভ পরীক্ষার খাতাখানা ঐ রুমের গার্ড নিবারণবাবুর নিকট নিয়ে দিল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন—"কি অমিতাভ, এর মধ্যেই হয়ে গেল ?"

অমিতাভ বলল—"আজ আর লিখব না স্যার।"

সে ক্লাসে সর্ব্বোত্তম ছেলে। মাত্র এক ঘণ্টা কয়েক মিনিট সময় গেছে ; এখনও প্রায় দু'ঘণ্টা বাকী ! এখনই সে যেতে চায় কেন ? সবাই উৎসুক হয়ে তা'র দিকে তাকাল। কিন্তু সে কোন রকম ইতস্ততঃ না ক'রে ভেলুর কাছে গিয়ে তা'র হাত থেকে পাখার দড়িটা নিয়ে অতি পরিচিতের মত সস্নেহে তা'কে বলল—"ভেলু, তুই এখন বাড়ী গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নে গে—যা। আমি টানছি ; তোর মাইনে কাটা যাবে না।"

এই ব'লে সে পাখা টানতে সুরু করে দিল। ঘরের লোক বিস্ময়ে অবাক্, ভেলু অপরাধীর মত নীরবে দাঁড়িয়ে ছল-ছল চোখে শাস্তির প্রতীক্ষা করতে লাগল।

হেডমাষ্টার মনোরঞ্জনবাবু খবর পেয়ে সে-ঘরে এলেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন শিক্ষক। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছে অমিতাভ ?"

অমিতাভ বলল—"স্যার, ভেলুকে আমি চিনি, ওর মায়ের খুব কঠিন অসুখ। কাল সারারাত ও তাঁর কাছে ব'সে ছিল; একটুও ঘুমোতে পারেনি। তাই আজ বারে বারে ওর ঘুম পাচ্ছে। কেরাণী সাহেব বললেন, ঘুমোলে ওর মাইনে

কাটা যাবে। তাই ওর হয়ে আমি টানছি। ও একটু ঘুমিয়ে নিক্ গে। ওরা, স্যার, বড় গরীব; ভাল ক'রে খেতে পায় না। জরিমানা করলে না খেয়েই মারা যাবে?"

শেষের কথাগুলো বলবার সময় অমিতাভের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল; চোখে জল টল-টল করতে লাগল।

বৃদ্ধ মনোরঞ্জনবাবু বালকের মহত্ত্ব দেখে মুগ্ধ হলেন। পকেট থেকে দুটি টাকা বের ক'রে ভেলুকে দিয়ে বললেন—

"তুই বাড়ী যা ; তোর মাইনে কাটা যাবে না। তোর মায়ের যা লাগে কিনে দিস্, আর যখন যা দরকার হবে আমাকে জানাস্, কেমন ?"

ভেলু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চ'লে গেল। তারপর অমিতাভের দিকে ফিরে মনোরঞ্জনবাবু বললেন—"অন্য লোক দিয়ে পাখা টানাচ্ছি, তুমি পরীক্ষা দেবে—এস।"

সে কাছে এলে সাদরে তা'র মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন—"অমিতাভ, আজ তোমার অন্তরের পরিচয় পেয়ে বড়ই আনন্দিত হয়েছি। আজ আমি গর্ব্ব বোধ করছি যে—তুমি আমার স্কুলের ছাত্র। দীন-দুঃখীর জন্য চিরদিন এমনি সমবেদনাই অন্তরে রেখো। তবেই ভগবান তোমাদের সুখী করবেন। আশীর্ব্বাদ করি, কৃতী সন্তান হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

মৃদু-মধুরকণ্ঠে উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা যেন ঘরের মধ্যে এক মোহন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করল। শিশির-ভরা ফুলে নাড়া দিলে যেমন ঝর-ঝর ক'রে তা' ঝ'রে পড়ে, তেমনি অমিতাভের গণ্ড বয়ে কয়েক ফোটা আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে, সে আবার পরীক্ষা দেবার জন্য তা'র সিটে গিয়ে বসল।

জীবন্ত দেবতা

স্মরণাতীত কাল থেকে জাপানের সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদ সমূহ মাঝে মাঝে সাগর-বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে এসেছে। এই ভীষণ বন্যা আসবার কোন নির্দ্ধারিত সময় ছিল না—কখনও বা দুই এক শতাব্দী পরেও এসেছে। ভূমিকম্প অথবা সাগর জলে নিমজ্জমান আগ্নেয়-গিরির অগ্নি উদ্গীরণের ফলে সমুদ্রের এই তাণ্ডব লীলার উৎপত্তি হয়ে থাকে। জাপানীরা এই তরঙ্গ-প্রবাহকে বলে 'সুনামি'। ১৮৯৬ সালের ১৭ই জুন বিকালে প্রায় দুইশত মাইল দীর্ঘ এক সাগর তরঙ্গ মিয়াগে, ইয়াতে ও আওমোরি প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে প্রতিহত হয়ে শত শত সহর গ্রাম ধ্বংস ক'রে ফেলে এবং প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 'মেইজী' যুগের বহুপূর্ব্বে জাপানের অপর উপকূলে এইরূপ মর্ম্মন্তুদ এক ঘটনা ঘটেছিল। হামাগুচি শোহেইকে অবলম্বন ক'রে এই কাহিনী প্রচলিত হয়েছে।

এই ঘটনার সময় হামাগুচি বৃদ্ধ। তাদের গ্রামের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী লোক। বহুদিন যাবৎ তিনি সেই গ্রামের প্রধান ছিলেন এবং সকল লোকই তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। গ্রামবাসীরা তাঁকে সাধারণতঃ 'ওজিছান' ব'লে ডাকত—জাপানী ভাষায় 'ওজিছান' মানে ঠাকুরদা। তিনি

ছিলেন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি; তাই কেউ কেউ তাঁকে 'চোজা'ও বল্‌ত। তিনি অল্পবিত্ত কৃষকদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তাদের ছোটখাটো গণ্ডগোল মিটিয়ে দিতেন এবং দরকার হলে টাকা দিয়েও সাহায্য করতেন।

উপসাগরের কাছেই একটি উপত্যকা। তার উপর হামাগুচির খড়ের ছাউনি দেওয়া বড় গোলাবাড়ি। তিনদিক থেকে উঁচু পাহাড় আর ঘন বন দিয়ে ঘেরা উপত্যকায় বেশ ধানের আবাদ হত। উপত্যকাটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে। নব্বইটি খড়ের বাসগৃহ ও একটি শিণ্টো মন্দির—এই নিয়ে গ্রামখানি উপত্যকার ঢালুর উপর থেকে নীচু পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ বিন্যস্ত—যেন ফ্রেমে আঁটা একখানি ছবি। পাহাড়ে উঁচু নীচু স্থানের উপর দিয়ে সরু সাদা পথটি এঁকেবেঁকে ঐ উপরে 'চোজার' বাড়ি পর্য্যন্ত উঠে' গেছে।

একদিন শরৎকালের বিকালে হামাগুচি গোহেই তাঁর ঘরের বারান্দার উপর থেকে নীচের দিকে চেয়ে ছিলেন। নীচে গ্রামের মধ্যে এক উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। সে বৎসর ফসল হয়েছে প্রচুর; তাই 'উজিগামী'র মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত সহ আনন্দোৎসবের আয়োজন। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন, নির্জ্জন পথের ধারে বাড়ীতে বাড়ীতে পতাকা উড়ছে; বাঁশের খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা দড়ির সঙ্গে রঙিন কাগজের লণ্ঠন হাওয়ায় দুলছে; মন্দির সুন্দর ক'রে সাজান, নানা রংয়ের

কাপড়চোপড় প'রে তরুণ-তরুণীরা সমবেত হয়েছে। তাঁর দশ বৎসর বয়স্ক এক নাতি। আর সবাই সকাল সকাল উৎসব-ক্ষেত্রে চলে গেছে। শরীরটা একটু দুর্ব্বল বোধ করায় তিনি যাননি; নইলে তিনিও গিয়ে উৎসবে যোগদান করতেন।

সেদিন ভারী গুমোট গরম। বিকালের দিকে বাতাস উঠেছে, কিন্তু তবু গরমের ভাব কাটেনি। জাপানী কৃষকদের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে হ'ল এরূপ অসহ্য গরম পড়লে সাধারণতঃ ভূমিকম্প হবার আশঙ্কা থাকে। হ'লও ঠিক তাই। সেই সময় একটু মৃদু কম্পন অনুভূত হ'ল—দীর্ঘ, অতি ক্ষীণ, কম্পিত দোলা। হামাগুড়ি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে শত শত ভূমিকম্প অনুভব করেছেন। কিন্তু এটি তাঁর কাছে বড়ই অদ্ভুত লাগল। মনে হ'ল যেন বহুদূরের কোন স্থানের কম্পনবেগের শেষ রেশটুকু মৃদু স্পর্শ দিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ঘরগুলো বারকয়েক দুলে উঠে আবার শান্ত হ'ল।

কম্পন থেমে গেলে বৃদ্ধের উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পল্লীর উপর। বাড়িগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে সমুদ্রতটে এক অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত-বিস্ময়ে তিনি পায়ের উপর ভর দিয়ে সমুদ্রের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে' দেখলেন,—মহাসাগর সহসা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে এবং সাগরের জল

তটভূমি ছেড়ে বাতাসের বিপরীত মুখে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের সকল লোক এই অপূর্ব্ব ঘটনার সংবাদ শুনতে পেল। তা'রা কেউ হয়তো ভূ-কম্পনটুকু অনুভব করেনি। সমুদ্র-জলের এই তীর ছেড়ে পিছিয়ে

যাওয়া দেখে সবাই বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেল। তাদের জীবনে তা'রা এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কখনও দেখেনি কিম্বা শোনেওনি। জল সরে যাওয়ায় বিস্তৃত সাগরবেলা ডাঙা হয়ে গেল এবং শৈবালে ঢাকা নূতন নূতন শৈল-সোপানশ্রেণী দেখা যেতে লাগল। লোকে তীরভূমি ধ'রে দৌড়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়ে সেই

অপরূপ, অলৌকিক দৃশ্য দেখতে লাগল। কিন্তু কেউ অনুমান করতে পারল না, এই বিশাল ভাটার তাৎপর্য্য কি হতে পারে।

হামাগুচি গোহেই নিজেও এরূপ ঘটনা কখনও দেখেননি; কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁর ঠাকুরদার কাছে এ ধরণের গল্প শুনেছিলেন মনে পড়ল। তা'ছাড়া সমুদ্রোপকূলের আশ্চর্য্য ঘটনাবলী কিছু কিছু তাঁর জানা ছিল। তিনি বুঝতে পারলেন, কি ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হতে যাচ্ছে! তিনি চিন্তা ক'রে দেখলেন সমস্ত গ্রামে সংবাদ পাঠাতে সময় লাগবে; বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতদের ব'লে যে বিপদসূচক বড় ঘণ্টাটি বাজাবেন, তাতেও অনেক সময় দরকার—দেরী করা তো চলে না মোটেই! তাড়াতাড়ি নাতিকে বললেন—"তাদা, শীগ্‌গির— শীগ্‌গির, আমার মশালটা জ্বাল্—"

'তাইমাৎসু' অর্থাৎ লম্বা মশাল সমুদ্রকূলে অনেক বাড়িতেই রাখা হয়। ঝড়ের রাতে ও কোন কোন শিণ্টো উৎসবে এগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বালকটি তৎক্ষণাৎ একটি মশাল জ্বেলে দিল। বৃদ্ধ সেটি হাতে নিয়ে দৌড়ে তাঁর শস্যগোলার প্রাঙ্গণে গেলেন। সেখানে শত শত শস্যের গাদা মাড়াই-এর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৃদ্ধ ক্ষিপ্রহস্তে একটির পর একটিতে দ্রুত আগুন লাগিয়ে দিতে লাগলেন। একে তো ধানের গাদাগুলো শুকিয়ে বারুদস্তূপের

মত হয়ে আছে, তার উপর আবার বাতাসের বেগ। দেখতে দেখতে সবগুলো গাদায় দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠল—রাশি রাশি ধূম মেঘের মত কুণ্ডলী ক'রে ঘূর্ণীবায়ুর মত পাক খেতে খেতে উপরের দিকে উঠতে লাগল। তাদা ভীত বিস্মিত হয়ে তা'র ঠাকুরদাদার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চীৎকার

ক'রে বলতে লাগল—"ওজিছান কেন ? ওজিছান কেন ?—কেন ?—কেন ?"

কিন্তু হামাগুচি কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর কৈফিয়ৎ দেবার সময় ছিল না। তিনি কেবল চিন্তা করছিলেন, চারশত বিপন্ন লোকের কথা। জ্বলন্ত গাদার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে

চেয়ে থাকতে থাকতে তাদার চোখ ফেটে জল এল। দৌড়ে সে বাড়ির দিকে ছুটে গেল। তা'র ধারণা হ'ল, তা'র ঠাকুরদাদা নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছেন। হামাগুচি সবগুলো গাদায় আগুন লাগিয়ে মশাল ফেলে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মন্দিরের পুরোহিত অগ্নিকাণ্ড দেখে ছুটে গিয়ে মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টা বাজাতে আরম্ভ করলেন। সমুদ্রতট ও গ্রামের চতুর্দ্দিক থেকে দলে দলে লোক দৌড়ে আসতে লাগল পিঁপড়ের ঝাঁকের মত। হামাগুচির মনে হচ্ছিল আরও দ্রুত সবাই আসে না কেন? প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁর কাছে অত্যন্ত দীর্ঘ ব'লে বোধ হচ্ছিল। সূর্য্য তখন অস্তাচলে। বহুদূর বিস্তৃত শুকনো তটভূমি অস্তরবির শেষ লোহিত আভায় কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। তখনও জলরাশি দিগন্তরালের দিকে ধেয়ে চলেছে উন্মাদের মত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথম সাহায্যকারী এসে পড়ল—একদল তরুণ কৃষক। তা'রা এসেই সোরগোল ক'রে আগুন নিভানোর আয়োজন করতে লাগল। 'চোজা' দু'হাত তুলে তাদের প্রতিরোধ ক'রে বললেন—"পুড়তে দাও—আগুন নিভাতে হবে না—আমি গ্রামের সবলোককে এখানে চাই। এক মহাবিপদ ঘনিয়ে আসছে—"

গ্রামের সবলোক দলে দলে চলে আসছে—বালক বৃদ্ধ, শিশু যুবক, তরুণ তরুণী। মহিলারাও সন্তান পিঠে নিয়ে এসে

উপস্থিত। সবাই বিস্ময়ে হতভম্ব—একবার চায় জ্বলন্ত অগ্নির দিকে, একবার হামাগুচির গম্ভীর মুখের দিকে। আগুন থামাবার কোন চেষ্টা নেই। সূর্য্য ডুবে গেলেন। সবাই এসে বালককে ঘিরে ধ'রে প্রশ্ন করে—"ব্যাপার কি?" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বালক বলল—"ওজিছানের মাথা খারাপ হয়েছে! আমার

ভয় হচ্ছে; তিনি পাগল হয়েছেন। নিজে ইচ্ছা ক'রেই তিনি আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। আমি দেখেছি।"

হামাগুচি চীৎকার ক'রে বললেন—"তাদা যা বলছে ঠিক। আমি নিজেই ধানের গাদায় আগুন দিয়েছি।......সবলোক এখানে এসেছে তো?"

গ্রামের মাতব্বর লোকেরা এদিক-ওদিক লক্ষ্য ক'রে দেখে বললেন—"হ্যাঁ, এসেছে—আর যারা বাকী আছে, শীঘ্রই এসে পড়বে। আমরা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না!"

সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত ক'রে বৃদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বললেন—"ঐ দেখ—এখন বল—আমি পাগল কিনা—"

গোধূলির ম্লান আলোকে সবাই সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করল। পূর্ব্বদিগন্তে দিকচক্র রেখায় অস্পষ্ট দীর্ঘ জলরেখা তুলির কালো টানের মত জেগে উঠল। তারপর ক্রমশঃ স্ফীত হতে হতে সেই সুদীর্ঘ জলোচ্ছ্বাস পাহাড়ের চূড়ার মত উঁচু হয়ে ভীষণ গর্জ্জনে তীরের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। জনতা সমস্বরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল—'সুনামি'! তারপর সব চীৎকার আর কোলাহল ডুবিয়ে দিয়ে, কর্ণ বধির ক'রে শত বজ্রের গর্জ্জনে সেই সমুদ্র-তরঙ্গ তীরের উপর ভেঙ্গে পড়ল। তরঙ্গ-শীর্ষে ফেনার মালা অনির্ব্বাণ বিদ্যুতের মত বিচ্ছুরিত হয়ে জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড আঘাতে পাহাড়সুদ্ধ থরথর ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল! জলকণাগুলো মেঘের মত আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে প'ড়ে সমস্ত উপত্যকা পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল; ভয়ার্ত্ত নরনারী এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে নিম্নে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখা গেল, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পল্লীখানি ছিন্নভিন্ন ওলটপালট ক'রে ফেলছে। দু'বার, তিনবার, পরপর পাঁচবার সাগরের ঢেউ এসে গর্জ্জন ক'রে পড়ল।

ক্রমশঃ ঢেউএর আকার ছোট হয়ে গেল। অবশেষে সমুদ্র-সৈকতের উপর ঢেউগুলো লুটিয়ে প'ড়ে মাতামাতি করতে লাগল।

উপত্যকার উপর জনতার মধ্যে কারও মুখে একটি কথা নেই। ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হতবাক হয়ে সবাই নীচে বিধ্বস্ত গ্রামের দিকে চেয়ে ছিল। সেখানে একখানা ঘর নেই—একটা খড়কুটো পর্য্যন্ত নেই। সমুদ্র তা'র লোলুপ তরঙ্গ-জিহ্বা দিয়ে সব লেহন ক'রে নিয়ে গেছে। শুধু দু'খানি খড়ের চালা এক জায়গায় স্তূপীকৃত হয়ে ঢেউএর সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মত নাচ্‌ছিল।

তখন প্রশান্ত কণ্ঠে হামাগুচি বললেন—"এখন বুঝতে পেরেছ, কেন আমি এই ধানের গাদায় আগুন দিয়েছিলাম।"

'চোজা' আজ সর্ব্বস্বান্ত। তাঁর সম্পত্তি ছিল ঐ ধানের গাদাগুলো। সেগুলো পুড়িয়ে তিনি চারশত গ্রামবাসীকে মৃত্যুর অনিবার্য্য কবল থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন। তাঁর বালক পৌত্র তাদা এতক্ষণে ঠাকুরদাদার আচরণের তাৎপর্য্য বুঝতে পেরে দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধ'রে তাঁকে কটুকথা বলার জন্য ক্ষমা চাইতে লাগল। জনসাধারণও বুঝতে পারল যে, তা'রা এখনও জীবিত রয়েছে কেবল ঐ নিঃস্বার্থ বৃদ্ধের দূরদৃষ্টি এবং উপস্থিত-বুদ্ধিরই জন্য। গ্রামের বুড়োরা কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় হামাগুচির সম্মুখে ধূলোয় লুটিয়ে প'ড়ে তাঁকে

প্রণাম নিবেদন করলেন। সকল লোকই তাদের অনুসরণ ক'রে তাঁর চরণে প্রণত হল।

বৃদ্ধের চোখে অশ্রু দেখা দিল। হয়তো এ আনন্দের অশ্রু, হয়তো বা দুর্ব্বল জরাগ্রস্ত দেহের উপর প্রবল উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া।

এইভাবে কাটিয়ে তা'র কণ্ঠে যখন কথা ফুটল, তিনি তাদার রক্তিম গণ্ডে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করতে করতে বললেন—"আমার বাড়ী রয়েছে; সেখানে অনেকের স্থান হবে। পাহাড়ের উপর মন্দিরটিও দাঁড়িয়ে রয়েছে;—অপর সকলেরও আশ্রয় হবে।"

তিনি ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন। জনগণের মধ্যে করুণ আর্ত্তনাদ ও কান্নার রোল প'ড়ে গেল।

দীর্ঘদিন পল্লীবাসীদের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, কেননা সেদিনে ভিন্ন স্থানে যাবার সহজ এবং দ্রুতগামী কোন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই সাহায্য আসতে দেরী হয়েছিল। সেই বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামবাসী যখন আবার সুদিন ফিরে পেল, তখন বৃদ্ধ হামাগুচি তাদের কৃতজ্ঞতার কোন দান গ্রহণ করেননি। কিন্তু তা'রা তাদের কর্ত্তব্য পালন করেছিল। মানুষের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে সম্মান তাই তা'রা তাঁকে দিয়েছে। নূতন ঘরদোর তৈরী করবার সময় তা'রা এক মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে ঐ মন্দিরের দ্বারদেশে এক ফলকে

স্বর্ণাক্ষরে বৃদ্ধ হামাগুচির নাম লিখে রাখে। গ্রামবাসিগণ তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ প্রত্যহ সেই মন্দিরে সমবেত হয়ে ধূপদীপ ও অন্যান্য নানা উপচারে দেবতাজ্ঞানে বৃদ্ধের পূজো করত। লোকে যখন তাঁকে এভাবে পূজো করত, তখনও তিনি পুত্র-পৌত্রাদি নিয়ে পূর্ব্বের ন্যায় সেই খড়ের চালাঘরে সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। প্রায় এক শত বৎসর তিনি মারা গেছেন। তাঁর মন্দির এখনও আছে। এখনও লোকে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আশায় তাঁর আত্মাকে পূজো ক'রে থাকে।*

---

* Lafcadis Hearnএর 'A Living God' গল্প অবলম্বনে।

সমবেদনা

কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিক। এর মধ্যেই উত্তর অঞ্চলের এ-দিকটায় শীত পড়ি পড়ি করছে। বৈকালে সুখসেব্য কবোষ্ণ সূর্য্যকিরণের মধ্যে চেয়ার টেনে ব'সে হৃষীকেশবাবু খবরের কাগজ খুলে নিয়েছেন। জার্ম্মাণ আক্রমণ মস্কো সহরের বহির্দ্বারে এসে প্রতিহত হয়েছে। এমন সময় সত্তর 'হুট্ হুট্' শব্দে মুখ তুলে দেখেন, গোপাল একটা ছাগলের দড়ি ধ'রে টেনে আনছে ; আর ভাগ্নে সন্তু একটা কঞ্চি দিয়ে হঠকারী ছাগলটিকে তাড়না ক'রে মাতুলের সহায়তা করছে। ছাগলটি দেখতে ভারী সুশ্রী। বেশ হৃষ্টপুষ্ট ; বোধ হয় আসন্নপ্রসবা। সর্ব্বদেহ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। লোমগুলো দিয়ে স্নিগ্ধ মসৃণতা ক্ষরিত হচ্ছে। পেট এবং পায়ের নীচ দিক সাদা। নাসিকা থেকে কপাল অবধি দুই দিকে চোখের উপর দিয়ে ভ্রূর আকারে শুভ্র তুলির রেখা নিপুণ শিল্পীর গভীর রসজ্ঞানের পরিচয় দেয়। সর্ব্বোপরি ওর বড় বড় কালো সরল চোখ দৃষ্টিমাত্রেই সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

হৃষীকেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"এ আবার কা'র ছাগল ধ'রে নিয়ে এলি ?"

—"কিনে নিয়ে এলাম আকালী বুড়ির কাছ থেকে। শীগ্‌গিরই বাচ্চা হবে"—গোপালের কথা শেষ করতে না দিয়েই সন্তু উৎসাহের সঙ্গে বলল—"হ্যাঁ বাবা, খুব ভাল বাচ্চা হবে। আমি নিয়ে খেলা করব—দুধ দিয়ে ভাত খাওয়াব—"

হৃষীকেশবাবু হাসলেন। বললেন—"তা দই-দুধ খুব খাওয়াও, কিন্তু তোমার মামাকে ব'লে দিয়ো আমার কপিগাছগুলো যেন বাঁচিয়ে চলে।"

গোপালের দিদির প্রসন্ন দৃষ্টিলাভ করায় ছাগলের যত্ন পরিচর্য্যার কোন ত্রুটী হ'ল না। কয়েকদিন পরে ছাগলটি যখন একটা বাচ্চা প্রসব করল, গোপালের বিশেষ ক'রে সন্তুর, আনন্দের আর সীমা রইল না। হরিণ-শিশুর মত সুন্দর কোমল শাবকটি সারাদিন প্রায় সন্তুর কোলে কোলেই থাকে। তাকে তা'র মায়ের দুধ খাওয়ান, কচি কচি ঘাস মুখে তুলে দেওয়া—এই নিয়েই সন্তুর দিন কাটে। তা'র ধারণা, সন্তু ঐ পরিচর্য্যাটুকু না করলে বাচ্চাটি হয়ত মরেই যেত! একদিন সে তা'র মাকে বলল—"মা, বাচ্চাটাকে আজ আমার কাছে নিয়ে ঘুমাব!"

মা বললেন—"তা হ'লে ওর মা যে কাঁদবে!"

—"তবে আমিই ওর কাছে শুই গে?"

মায়ের চোখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মৃদু হেসে বললেন—"তা হ'লে আমি যে কাঁদব!"

সন্তু মায়ের চোখের দিকে চাইল। কি দেখল সেই জানে। দুষ্টুমি ভরা হাসি হেসে ছাগল-ছানার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বলল—"ইস্, আমি যে এখন বড় হয়েছি।"

পাঁচ বছরের বালক সন্তু। তা'র ধারণা সে এখন মস্ত বড় হয়েছে—মায়ের কোলের কাছে থাকার বয়স অনেক আগেই

সে পার হয়ে গেছে। স্নেহবর্ষী দৃষ্টিতে মা দুই ধাবমান শিশুর প্রতি চেয়ে থাকেন।

* * *

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বৃহস্পতিবারে জন্ম ব'লে ছাগল-ছানার নাম হয়েছে বিশু। বিশুর সঙ্গে আনন্দে

দৌড়াদৌড়ি করতে করতে ভাঙ্গা কাচের টুকরায় সন্তুর পা লেগে কেটে রক্ত পড়তে লাগল। গোপাল জল দিয়ে ভাল ক'রে ধুইয়ে গাঁদা ফুলের পাতা ছেঁচে পট্টি বেঁধে দিল।

কিন্তু চঞ্চল বালক কতক্ষণ তা ঠিক রাখবে? কয়েক দিনের মধ্যে পা ফুলে গেল। ব্যথায় ও প্রবল জ্বরে সন্তুকে এবার শয্যা গ্রহণ করতে হ'ল। এখানেই শেষ নয়। ক্রমে দাঁতে-দাঁত চেপে নবনীত কোমল বালকের দেহ ধনুকের মত বেঁকে শক্ত হয়ে গেল। ডাক্তার এসে বলল, 'ধনুষ্টঙ্কার'। টিটেনাসের ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হ'ল। চতুর্থ দিনে ছিন্ন-জ্যা কুসুমাবৃত ধনুকের মত বালকের সুকুমার তনু ক্রমে তা'র স্বাভাবিক কোমলতা ফিরে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সন্তু শেষবারের মত তাকিয়ে দেখে চক্ষু মুদিত করল। সন্তুর জননী একবার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠে সংজ্ঞাহারা হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন।

* * *

বহু সেবা যত্নে দু'দিন পরে সন্ধ্যায় সন্তু-জননী প্রতিভার জ্ঞান ফিরে এল। তাঁর উদাস চোখের শূন্য দৃষ্টিতে সকলে বুঝল তিনি এখনও প্রকৃতিস্থ হননি। অনেক সাধ্যসাধনা ক'রেও তাঁর মুখে একটুকু জলও দেওয়া গেল না। ওদিকে ছাগলটা অবিরত চীৎকার করছিল। প্রতিভা ঝির দিকে চেয়ে বললেন—"ওটা যে চীৎকারে অস্থির করল। ওকে কিছু খেতেটেতে দিস্ না কেন?"

ঝি কুণ্ঠিত হয়ে বলল—"খাবার তো সামনেই রয়েছে। সে জন্য তো নয়! কয়েকদিন এলোমেলোর মধ্যে খোপের দরজা বন্ধ করা হয়নি। শিয়ালে বাচ্চাটা নিয়ে গিয়েছে। তাই ওরকম—"

জননী শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শূন্য বিছানা আঁকড়ে নিজ্জীবের মত প'ড়ে রইলেন।

সমস্ত বাড়ীটা বিষাদে স্তব্ধ, বিমর্ষ। শুধু থেকে থেকে একমাত্র সন্তানহারা একটি পশু-হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যথা বুক ভাঙ্গা আর্ত্তনাদে প্রকাশ করছে। হৃষীকেশবাবু দিনরাত পত্নীর পাশে বসে সেবা করছেন। তাঁর আশঙ্কা পুত্রশোকাতুরা কখন বা কি অনর্থ ক'রে বসে! রক্তমাংসের শরীরে কত আর সহ্য হয়! তিনিও শ্রান্ত, ক্লান্ত, শোকার্ত্ত! কখন তন্দ্রাতে ঢুলে পড়েছেন কিছুই টের পাননি। কতক্ষণ এ ভাবে কেটেছে তাও জানেন না। হঠাৎ তন্দ্রাভঙ্গে বিছানায় পত্নীকে না দেখে তাঁর বুকের মধ্যে ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌ল,—কোথায় গেল? তাড়াতাড়ি টর্চটা খুঁজে নিয়ে ঘরের মধ্যে জ্বেলে দেখলেন কোথাও নেই। দরজা উন্মুক্ত। কি দৃশ্যই বা দেখতে হবে এই আশঙ্কায় তাঁর হাত পা কাঁপতে লাগল। পিছনের পুকুরে যায়নি তো? নিঃশব্দে টলতে টলতে তিনি ঘর হ'তে বের হলেন। সহসা এদিক ওদিক টর্চ ফেলতেও সাহস হয় না। ছাগলের ঘরের কাছে গিয়ে একবার

টর্চ জ্বেলে বহুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখেন, প্রতিভা ছাগলটির গলা বেষ্টন ক'রে তা'র মুখ নিজের মুখের

কাছে তুলে ধ'রে বসে রয়েছেন। অশ্রু-ধারায় উভয়ের গণ্ডদেশ ভেসে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে পত্নীর হাত ধ'রে হৃষীকেশবাবু বললেন—"চল্, ঘরে যাই!"

চরণ গোয়ালা

শীতের সকাল। ঘোলাটে কুয়াসার একখানা আবরণ রাত্রিতে সমস্ত পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছিল। ভোর হয়ে গেছে; পূবদিকের আকাশে শাদা-কালো মেঘের উপর রক্তিম আভা দেখা দিয়েছে। তাই ধরণীর রাত্রির গাত্রাবাস কে যেন ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছে। শিশির-সিক্ত মাঠের মধ্যে, নদীর ধারে স্বাস্থ্যকামী প্রবীণের দল লাঠি হাতে ঠক-ঠক ক'রে প্রাতভ্র্মণ ক'রে ফিরছিলেন। হঠাৎ পুলিশ সাহেবের বাংলোর কাছে আর্দ্র বাতাসের মধ্যেও আওয়াজ হ'ল —সপাং; সঙ্গে সঙ্গে একটি মনুষ্যকণ্ঠের তীব্র আর্ত্তনাদ একবার উঠেই থেমে গেল। পর পর সপাং সপাং শব্দ বাতাসের মধ্যে যেন বিদ্যুতের সঞ্চার করতে লাগল। ওই শব্দ কাণে যেতেই শিরায় শিরায় প্রতি আঘাতের সঙ্গে একটা অব্যক্ত অনুভূতি শির্ শির্ ক'রে উঠে। কয়েকজন ভদ্রলোক দ্রুত এগিয়ে গেলেন। দেখেন, পুলিশ সাহেবের নেপালী চাপরাসী একটি লোকের উপর নির্ম্মমভাবে চাবুক চালাচ্ছে। সাহেব অদূরে বাংলোর বারান্দায় দুই পা ফাঁক
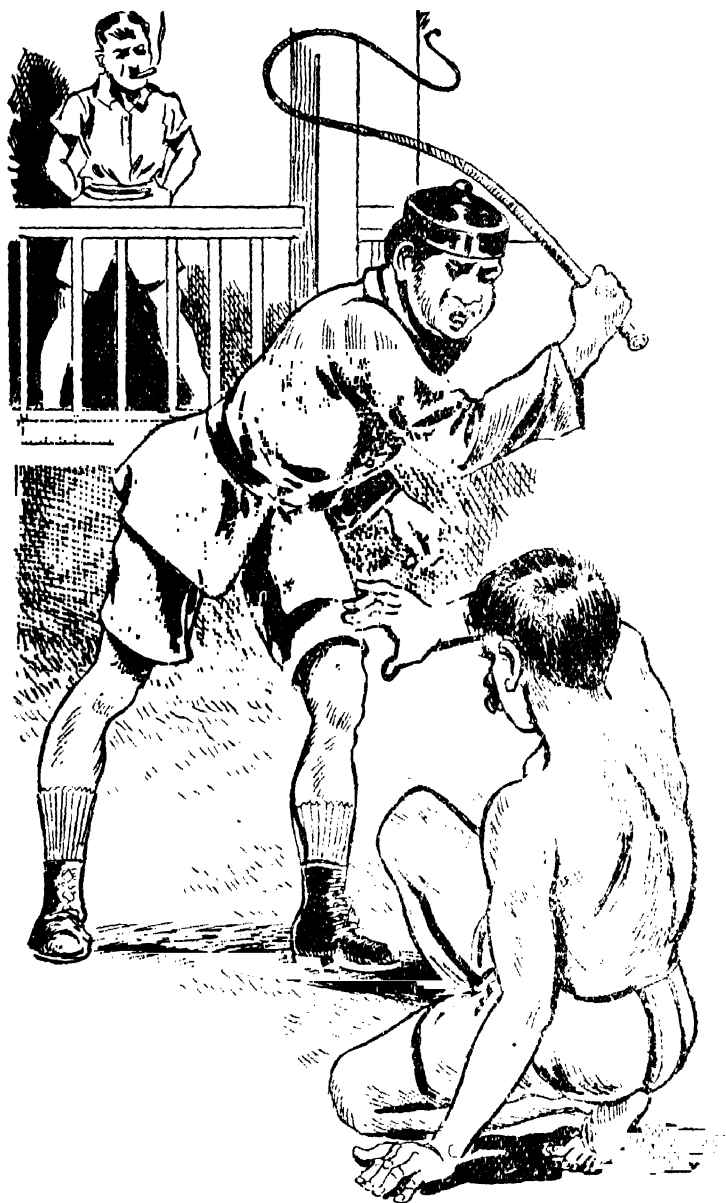
ক'রে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছেন। তাঁর দু'হাত প্যাণ্টের পকেটে প্রবিষ্ট; মুখে জ্বলন্ত সিগার। একজন ভদ্রলোক নেপালীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি চাপরাসী ?"

"ধাড়ী চোর, বাবু"—ব'লেই নেপালী আবার চাবুক চালাতে লাগল। চোর বেচারী মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছিল, মুখে তা'র শব্দ নেই, কিন্তু প্রতি অঙ্গ নিষ্ঠুর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে থর-থর ক'রে কেঁপে উঠছিল। লিক্‌লিকে বেতের চাবুক সর্পিল গতিতে তা'র নগ্ন দেহের যেখান দিয়ে গিয়েছে সেখানে বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠেছে। সাহেব হুকুম দিলেন—"বহুৎ হুয়া। আভি ছোড় দেও।"

চাপরাসী চলে গেল। এক ব্যক্তি চোরকে দেখে চিনলেন। বললেন—"আরে! এ যে চরণ গোয়ালা! ওর আবার এ দুর্ম্মতি হ'ল কবে থেকে! ও তো জানি লোক ভাল। একপোয়া দুধে তিনপোয়া জল দিয়ে যারা খাঁটি দুধ বিক্রি ক'রে চরণ তো সে দলের গোয়ালা নয়। অথচ ওর মনে মনে এই অভিসন্ধি ছিল! চুরি করবি তো বাপু ছোটখাটো জায়গায়ই যা। এ যে একেবারে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!"

সবাই চলতে আরম্ভ করেছে। চরণ তখনও অসাড় দেহে ভূলগ্ন হয়ে পড়েছিল। মাঝে মাঝে শরীরের স্থানে স্থানে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তাই তো। নিজের ব্যবসাতে চুরি করবার অবাধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সাধুতা বজায়

রেখে চলে, তা'র এ দুর্ম্মতি হ'ল কেন ? বুঝতে হ'লে চরণের পূর্ব্ব ইতিহাস কিঞ্চিৎ বলা দরকার।

চরণ জাতিতে গোয়ালা। চারটি দুগ্ধবতী গাভী, স্ত্রী, নয় বছরের এক মেয়ে, আর সাত বছরের এক ছেলে নিয়ে তা'র সংসার। প্রচুর দুধ হয়। তা থেকে ছানা মাখন ঘি প্রস্তুত ক'রে স্বচ্ছলভাবে চরণের সংসার চলে যায়। একমাত্র পুত্র ছানা মাখন দুধের প্রাচুর্য্যের মধ্যে নধরদেহ হয়ে বেড়ে উঠে। শ্যামবর্ণ সুশ্রী ছেলে ; নাম ভানু। বাবা মা ভাবেন, মা যশোদার ঘরে এই ভানুই বুঝি ভুবন-আলো-করা রূপে এসেছিলেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ললিতা ভানুকে চন্দনের ফোটায় সাজিয়ে মাকে ডেকে বলল—"দেখ মা, ঠিক ঐ পটে আঁকা কেষ্ট ঠাকুরের মত ভানুকে দেখাচ্ছে ! এখন হাতে একটা বাঁশী দাও ; বাছুরগুলো নিয়ে গোঠে যাক্"—ব'লে নিজেই হাসতে লাগল। মাও সে হাসিতে যোগ দিলেন। লজ্জিত ভানু 'ধ্যাৎ' ব'লে মুখের চন্দন-চিহ্নগুলো মুছে ফেলে ছুটে ঘর হ'তে বের হয়ে গেল। মা হাসতে হাসতে ডাকলেন—"ওরে পাগ্‌লা, শোন্ শোন্।"

চরণের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির সংসার। কিন্তু এত সুখ তা'র সইল না। কালবৈশাখীর রুদ্র ঝড় যেমন অতর্কিতে আকাশের এক প্রান্ত হতে উঠে নদীবক্ষে ভাসমান অসতর্ক নৌকাগুলো উল্টে পাল্টে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে চলে যায়,

দেবরোষে চরণের সংসার-তরীও তেমন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। গ্রামে কলেরার মহামারী দেখা দিল। এই মৃত্যুবন্যার প্রবাহে সাতদিনের মধ্যে তা'র একান্ত আপনার জন কে কোথায় ভেসে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে রয়ে গেল কেবল সে নিজে আর তা'র গাভী কয়েকটি।

মহামারী থামল। মন্দিরে আবার সন্ধ্যারতি হয়; সাঁঝের বাতাসে কেঁপে কেঁপে কাঁসর ঘণ্টা বাজে। কিন্তু চরণের অন্তরে আর তা'র প্রতিধ্বনি হয় না। সে তা'র অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে; ভাল ক'রে বুঝতে পারে না, তা'র কি আছে আর কি নেই। ভাবে, এটা কি স্বপ্ন, না সংসারের রীতিই এই। কাল যারা তাকে ঘিরেছিল এবং যাদের জন্যই বাঁচা সার্থক মনে করত, আজ তা'রা সবাই ফাঁকি দিয়ে কোথায় চলে গেল। তবু তা'কে বাঁচতেই হবে? নাঃ নিজের এক পেটের জন্য সংসার-গন্ধমাদন ঘাড়ে ক'রে বইবার দরকার নেই। যেদিকে চোখ যায় চলে যাবে—যে ভাবে চলে চলবে।

গাভী হাম্বাধ্বনি করল। সারাদিন ওরা ঘাস পায় নাই। চরণের চিন্তাস্রোতে বাধা পায়। তাইত ওদের কথা তা'র তো মনেই আসেনি। একটি গাভী আসন্ন-প্রসবা। কি স্নিগ্ধ শান্ত চোখের দৃষ্টি! চরণ উঠে গিয়া ঘাস দিল। একদৃষ্টে সে চেয়ে থাকে ছোট বাছুরটার কোমল চোখের দিকে। তা'র

চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে ভানু-ললিতার কালো চোখ। বাছুরটিকে সে কোলের মধ্যে চেপে ধরে। গাভী সস্নেহে বাছুরটির সর্ব্বদেহ লেহন করতে থাকে। আরামে তা'র চক্ষু মুদিত হয়ে আসে; চরণের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। এইভাবে বহুক্ষণ কেটে যায়।

চরণ সংসার ত্যাগ করতে পারল না। কিরূপেই বা পারবে? জড়ভরতের মত নিঃস্পৃহ যোগী সন্ন্যাসীও সামান্য একটা হরিণ-শিশুর মায়ায় আবদ্ধ হয়েছিলেন,—চরণ তো গৃহী তা'র উপর সন্তানহারা। কিন্তু গৃহ তা'র পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। উঠোনের প্রতি ধূলিকণা পর্য্যন্ত যে তা'র ছেলে-মেয়েদের কথা মনে করিয়ে দেয়! প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে ছোট একটি কাঠের ঢেঁকি, ছোট ছোট মাটির খেলনা, রান্নার হাঁড়ি-বাসন, ভানুর একটা মাটির ঘোড়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। চরণ সেগুলো গুছিয়ে রাখে। এই প্রাণহীন জিনিসগুলোর স্পর্শের মধ্যে দিয়েই সে যেন তা'র সন্তানদের স্পর্শানুভূতি লাভ করতে চায়।

অবশেষে গাভী কয়েকটি নিয়ে চরণ সহরে এসে বসল। সকাল বিকালে বাসায় বাসায় দুধ যোগান দেয়; গরুবাছুরের তত্ত্বাবধান করে। চরণের হাতে খাঁটি দুধ পাওয়া যায়। তা'র সুনাম আছে। সব জায়গার চাহিদা সে মেটাতে পারে না। দিনের পর দিন এই ভাবে গড়িয়ে চলেছে।

কয়েক বৎসর কেটে যায়। শোক সে প্রায় ভুলেই গেছে। সে এখন হাসে—সমবয়সীদের সঙ্গে ঠাট্টা-কৌতুকও করে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথি। চরণ বিকালে কয়েক বাসায় দুধ দিতে বেরিয়েছে। পথে সাজগোজ করা নূতন কাপড় পরা ছেলেমেয়ের দল। একটি ছেলেকে দেখে হঠাৎ চরণের দৃষ্টি তা'র উপর স্থির হয়ে গেল। ঠিক তা'র ভানুর চেহারা। কপালে গণ্ডে চন্দনের ফোঁটা, সঙ্গে তা'র কিশোরী দিদি। চরণ অনিমেষ নয়নে তা'র দিকে চেয়ে রইল। মনে হ'ল একবার ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নেয়। কত বছর চলে গেছে। ভানুর স্মৃতি যেমন উজ্জ্বল, যেমন জীবন্ত রয়েছে, তা'র ভানুও বুঝি তেমনি কচিই আছে! বয়সের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। অজ্ঞাতে তা'র দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল এবং কলগুঞ্জনমুখর বালকবালিকার দলের সঙ্গে সঙ্গে নীরবে সেও চলতে লাগল। তা'র ফিরে পাওয়া ভানু-ললিতা যে বাসায় প্রবেশ করল, তা'দিগকে অনুসরণ ক'রে চরণও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ডাকল—"মা, একটু দুধ আছে, রেখে দিন, মা।"

রান্নাঘর থেকে কে উত্তর দিল—"বকুল, দেখ্‌তো কে ডাকে?" মেয়েটি এগিয়ে এসে বললো—"কি এনেছ?"

চরণ বলল—"একটু দুধ খুকুমণি! একটা বাসন আন। বকুলের মা বের হয়ে আসলেন। প্রতিমার মত সুন্দর মুখশ্রী,
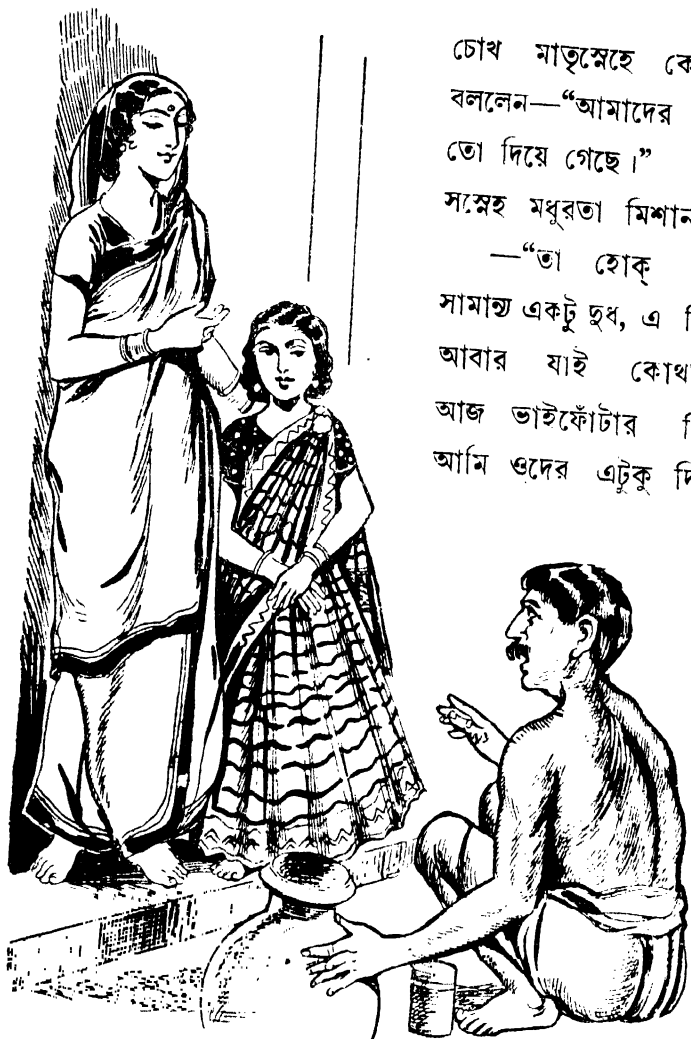
চোখ মাতৃস্নেহে কোমল, বললেন—"আমাদের দুধ তো দিয়ে গেছে।" কণ্ঠে সস্নেহ মধুরতা মিশান।

—"তা হোক্ মা, সামান্য একটু দুধ, এ নিয়ে আবার যাই কোথায়। আজ ভাইফোঁটার দিন, আমি ওদের এটুকু দিতে এসেছি।" তারপর বকুলের দিকে চেয়ে বলল—"নিয়ে যাও

দিদিমণি! ভাইকে পায়েস ক'রে দিয়ো। নিজে সত্যি পায়েস রাঁধতে শিখেছ তো? না জল আর মাটি দিয়ে রাঁধো?" ব'লে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল হ'ল। চোখে তা'র জল এসে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে জল মুছে ফেলে বলল—"ওঃ! কি উড়নী পোকাই এসেছে এ সহরে!"

চরণ একটা ঘটির মধ্যে দুধটুকু ঢেলে দিল। বকুলের মা বললেন—"এ যে অনেকখানি দেখ্‌ছি। আজ সন্ধ্যায় কিন্তু তুমি আসবে। কেমন, কথা দিলে?"

চরণ হাসল। বৃদ্ধের সরল হাসি—"হেঁ-হেঁ-হেঁ। আজ না আসি কাল তো আসবই।"

"দাঁড়াও দাম নিয়ে আসছি।"—ব'লে বকুলের মা দুধ নিয়ে ঘরের দিকে গেলেন। চরণ আর দেরী করল না। যেন ভীত হয়ে কাশতে কাশতে দ্রুতপদে বাসা হ'তে বেরিয়ে পড়ল।

চরণ এখন প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে দুধ নিয়ে বকুলদের বাসায় উপস্থিত হয়। ডাকে—"দিদিমণি, মুকুলবাবু!"

বকুল এসে দুধ নেয়। মুকুল বড় আসতে চায় না; দিদির আঁচল ধ'রে একটু দূরে দূরেই থাকে। চরণের সাধ হয় মুকুলকে কোলে নিয়ে একটু ঘুরে আসে। কিন্তু তা'র সঙ্কোচই সে ভাঙ্গতে পারে না। গাছের একটা পাকা আতা, কোনদিন বা দুটি কমলা সে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে আনে

মুকুলের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা করবার মানসে। ঘুষের ফলও কিছু হয়। মুকুল চরণের কাছে আসে। সে তা'কে ব্যগ্রভাবে কোলে নিতে যায়, কিন্তু লাজুক দুষ্টু ছেলে আতা নিয়েই ছুটে পালায়।

একদিন বিকালে দুধ নিয়ে এসে চরণ দেখে মুকুল চীৎকার ক'রে কাঁদছে। সে বলল—"আজ মুকুলবাবুর ভারী রাগ দেখছি যে। আমার দিদিমণি কই গো?"

বকুলের মা বেরিয়ে এলেন; বললেন—"আর বলো না বাপু! আজ ওর জেদ্ উঠেছে। বকুল কোত্থেকে একটা গোলাপ নিয়ে এসেছে। এখন মুকুলেরও তাই চাই। সে খোঁপায় পরবে ব'লে নিয়ে পালিয়েছে আর মুকুলও হাতপা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। ও-ও নাকি খোঁপায় পরবে"—ব'লে মা হাসতে লাগলেন।

মায়ের হাসিতে মুকুলের কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। চরণ মুকুলকে উদ্দেশ ক'রে বলল—"মুকুলবাবু, তুমি কেঁদো না। তোমাকে ম—স্ত বড় একটা গোলাপ এনে দেব; তা'র এমন সুন্দর রঙ যে, দেখবে দিদিরটার চেয়ে কত ভাল!"

নেপথ্যে কান্নার সুর একটু ঢিমে তাল ধরল; একেবারে থেমে গেল না। বাইরে এসে চরণ সিভিল সার্জ্জন ঘোষ সাহেবের বাসার দিকে দ্রুত পা বাড়িয়ে দিল। বাগানের মালী নিশির সাথে চরণের পরিচয় আছে। তা'কে চুপি

চুপি বলল—"ভাই নিশিকান্ত, আমাকে আজ একটা ভাল গোলাপ দিতে হবে।"

নিশিকান্তের মেজাজ তখন ভাল ছিল। রসিকতা ক'রে বলল—"কাউকে দেবে নাকি? না নিজেরই কোটের জন্য?"—ব'লে সে হাসতে লাগল।

"একটু সখ হয়েছে ভাই। চিরকাল দুধদই ঘেঁটে ঘেঁটে আর ভাল লাগে না। তোমার তো সুখের চাকরি—এমনি একটা পেলে"—চরণও হেঁ-হেঁ-হেঁ ক'রে হাসতে লাগল।

কাঁচি দিয়ে সযত্নে একটি চমৎকার সুগন্ধ গোলাপ পাতা-সমেত তুলে এনে নিশি চরণের হাতে দিল। বলল—"এর নাম জান? ব্ল্যাক্‌পিন্স। সাবধান, সায়েবের নজরে যেন না পড়ে।"

"ভোরে বাচ্চাকে দিয়ে একটা ঘটি পাঠিয়ে দিয়ো; খানিকটা দুধ নিয়ে আসবে।"—ব'লে চরণ ফুলটি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে দ্রুত প্রস্থান করল। পথে একবার আঘ্রাণ নিয়ে দেখল। কাপড়ে ঢাকা; তথাপি কেমন স্নিগ্ধ মধুর সৌরভ। নাসিকার তৃপ্তি হয় না। বেশী ঘ্রাণ নিতেও তা'র ভয় করে, পাছে গন্ধ ক'মে যায়।

ফুল পেয়ে মুকুলের আনন্দ ধরে না। চোখের কোণে জল টলটল করছে, কিন্তু বিমল হাসিতে মুখখানি ভ'রে গেছে

—যেন বৃষ্টিস্নাত শরতের প্রাতে রবির এক টুকরা কোমল কিরণ। চরণের ব্যগ্র বাহুপাশ হ'তে মুক্ত হয়ে মুকুল নাচতে নাচতে দিদির কাছে দৌড়ে যায়, বলে—"দেখ, কেমন সুন্দর ফুল। তোমারটা ভাল না।" চরণের দিকে ফিরে বলে—"আরও দিতে হবে কিন্তু।"

বৃদ্ধের অন্তর তৃপ্তিতে ভ'রে গেল। মুকুল তা'র কাছ থেকে ফুল পেয়ে ভারী খুশী হয়েছে। যাক্ মুকুলের সঙ্কোচ কেটে গেছে। একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে চরণ উঠে পড়ল।

চরণ পরদিন দুধ নিয়ে এসেছে। নিজের বাড়ীর গাছ হ'তে একটা জবাফুল তুলে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। 'দিদিমণি' ডাক দিবামাত্র মুকুল দৌড়ে গিয়ে চরণকে ধরল, বলল—"আমার গোলাপ কই? দেখি কাপড়ের মধ্যে?"

কাপড় খুলে জবাটা হাতে নিয়ে বার দুই উল্‌টিয়ে দেখে মুকুল সেটি মাটিতে ফেলে দিল। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল—"এই বুঝি গোলাপ! গন্ধ নেই—কেমন পাতলা। ও আমি চাই না—"

বকুলের মা এগিয়ে এলেন; বললেন—"তোর জন্য বড় গোলাপ প্রত্যেক দিন পাবে কোথায়? নিজে ফুলের গাছ লাগিয়ে দে; দেখিস কত ফুল হবে।...হ্যাঁ বুড়ো,

তোমার দুধের দামগুলো আজ নিয়ে যাও। কয়েক মাস তো নাও নি।"

—"থাক্ মা এখানেই। আমি গরীব মানুষ, তায় আবার একা। কোথায় রাখব, কি হবে! কি দরকার! এখানেই থাক্, যখন দরকার হয় চেয়ে নেব। আমার যা আছে তাই কে খায়!"

—"তবে তোমার নামে পোষ্ট অফিসে একটা পাশবুক করিয়ে দিই?"

—"কি দরকার মা, ঘরের টাকা পরের হাতে দিয়ে?"

বৃদ্ধ বা'র হয়ে গেল। অভিমানী মুকুলের মুখ তাকে বড়ই ব্যথিত করতে লাগল।

রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে,—মুকুল ঠোঁট ফুলিয়ে গম্ভীর হয়ে ব'সে আছে। মুকুল? না, তা'র ভানু? সে কত ডাকল, কিন্তু কিছুতেই তা'র কাছে এল না। ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখে অশ্রুজলে বালিশ ভিজে গেছে।

হঠাৎ তা'র মনে হ'ল পুলিশ সাহেবের বাংলোয় খুব ভাল ভাল গোলাপ আছে। ভোর হয়ে গেছে। পুরাণো গায়ের কাপড়খানা টেনে নিয়ে নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অস্পষ্ট অন্ধকার—চারদিকে কুয়াসা। ফুল দেখা যায়, কিন্তু রঙ্ চেনা যায় না। অতি সাহসে কম্পিত বক্ষে চরণ বাগানের

মধ্যে প্রবেশ করল। প্রহরীর কথা সে কল্পনাতেও আনেনি। একটি ফুল তুলেছে, এমন সময় পিছন দিক হ'তে চুপি চুপি এসে কে যেন তা'কে সাপটিয়ে ধরল। চরণ পালাবার চেষ্টা করল না। নেপালী চাপরাসী চোরের গলায় কাপড় দিয়ে টানতে টানতে সাহেবের কাছে নিয়ে গেল।

বিচারের ফলাফল প্রথমেই বলা হয়েছে।

তীর্থযাত্রী

অনেক দিন আগের কথা। ভাদ্র মাস। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি প্রহরখানেক অতীত হয়েছে। নির্জ্জন অসমতল পথ দিয়ে পাঁচজন অশ্বারোহী অতি সন্তর্পণে অশ্ব চালনা করছিলেন। অন্ধকারে ভাল ক'রে পথ দেখা যায় না। সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত। ঘোড়াগুলোর সর্ব্বদেহ ঘর্ম্মসিক্ত—তাদের মুখ হ'তে সাদা ফেনা রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ছে। আরোহী দল পূর্ব্বমুখে চলেছে। মাথার উপর বৃশ্চিকরাশির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র দপ্ দপ্ করছে; বামদিকের আকাশে ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র ক'রে সপ্তর্ষিমণ্ডল নিঃশব্দে আবর্ত্তন ক'রে চলেছে।

মথুরাপুরীর বহিঃপ্রান্তে এক বাগানের বৃক্ষতলে সকলে অশ্ব হ'তে অবরোহণ ক'রে বিশ্রাম করতে লাগলেন। একজন যাত্রী কিশোর-বয়স্ক। পথশ্রমে ও পিপাসায় তিনি এতদূর অবসন্ন হয়েছিলেন যে, ঘাসের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। অপর একজন বালকের মস্তক নিজের উরুর উপর তু'লে নিয়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ যাত্রীদের মধ্যে অতি মৃদুকণ্ঠে কি কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর একজন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—"দেখি, কোন ব্যবস্থা করতে পারি কি না?"

ছায়ামূর্ত্তির মত তিনি অন্ধকারে অন্তর্হিত হলেন।

বহুক্ষণ অতীত হ'ল। ছায়ামূর্ত্তি আবার ফিরে এলেন—সঙ্গে নূতন এক ব্যক্তি। অধিক বাক্যব্যয় হ'ল না। অনুচ্চ একটি তুড়ি দিয়ে নবাগত বললেন—"আসুন আমার সঙ্গে।"

সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত পথপ্রদর্শককে অনুসরণ করলেন। মথুরা নগরীর বহু নির্জ্জন গলি ও উদ্যান অতিক্রম ক'রে তাঁ'রা যখন এক প্রকাণ্ড বাড়ীর অন্দরমহলের দরজায় এসে উপস্থিত হ'লেন, তখন মধ্যরাত্রি। পথপ্রদর্শক দ্বারে মৃদু করাঘাত করলেন। ভিতর হ'তে প্রশ্ন হ'ল—"কে?"

উত্তর হল—"কৃষ্ণ!"

দরজা উন্মুক্ত হ'ল এবং সকলে প্রবেশ করলে পুনরায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

* * *

শেষরাত্রিতে সেই বাড়ী হ'তে তিনজন সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রায় বা'র হ'লেন। এদের মধ্যে দু'জন যে সেই অশ্বারোহী দলের তা চিনবার উপায় কারও নেই। তাঁদের মস্তক এখন মুণ্ডিত, পরিধানে গেরুয়াবাস, সর্ব্বদেহে ছাই মাখানো। বাহু ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে মোটা লাঠি। দণ্ডধারী সন্ন্যাসীত্রয় কাশীধাম দর্শনের উদ্দেশ্যে চলেছেন। দিবাভাগে জনবিরল স্থানে বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করেন; রাত্রিতে পথ চলেন। পথ

বিঘ্ন ও বিপদে পূর্ণ। দস্যু-তস্কর ছাড়াও রাজপুরুষের হাতে নির্য্যাতনের আশঙ্কাও কম নয়। তখন মুসলমান রাজত্বকাল। পথে পথে ফৌজদারের থানা। অপরিচিত বিদেশী সহজে এদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। এলাহাবাদ পৌঁছবার পূর্ব্বে এক ফৌজদারের প্রহরী সন্ন্যাসীদের ধ'রে ফৌজদারের নিকট নিয়ে গেল। তিনি ভয় দেখালেন যে সন্ন্যাসীদের বন্দী ক'রে দিল্লী পাঠাবেন।

গভীর রাত্রিতে সন্ন্যাসীরা ফৌজদারের কাছে গিয়ে বললেন—"আমাদের তীর্থদর্শনের পথে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করবেন না। যদি টাকা চান, আপনাকে এক লক্ষ টাকার হীরা ও মণি-মাণিক্য দেব। আপনি আমাদের মুক্তি দিন্।"

সন্ন্যাসীদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ফৌজদার হেসে বললেন—"আমার কাছে বাকী কারবার নেই। তোমাদের সঙ্গে নগদ তো দেখছি গেরুয়া আর কাঠের কয়েক ছড়া মালা।"

সন্ন্যাসী ছুরি দিয়ে লাঠির এক-মুখের ছিপি খুলে ফেলে উল্টো ক'রে ধ'রে ঝাড়া দিলেন। ফাঁপা লাঠির ভিতর হতে কতকগুলো মোহর ও মণি ঝরঝর ক'রে মেঝের উপর ছড়িয়ে প'ড়ে উজ্জ্বল আলোকে ঝকমক ক'রে উঠল।

আলাদীনের প্রদীপের অদ্ভুত ভোজবাজীর মত

ব্যাপারটা ঘটে গেল। বিস্মিত ফৌজদার বললেন—"যান, আপনারা মুক্ত।"

আর কালবিলম্ব না ক'রে যাত্রিগণ তখনই বা'র হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং এইভাবে পথ চলবার পর ত্রিবেণীর পুণ্যতীর্থে স্নান ক'রে কয়েকদিনের মধ্যেই কাশীধামে উপস্থিত হ'লেন।

*　　　*　　　*

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট। অতি প্রত্যূষেও গঙ্গাস্নানার্থীদের ভীড় হয়েছে।

একজন বালক-পুরোহিতের কাছে দু'জন সন্ন্যাসী যাত্রী উপস্থিত হলেন। এক ব্যক্তি ঈষৎ খর্ব্বকায়; অপর জন দীর্ঘাকৃতি। খড়্গের মত তীক্ষ্ণ তাঁর নাক, মুখমণ্ডল বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার আভায় উজ্জ্বল।

তিনি পুরোহিতের হাতের মুঠোর মধ্যে কতকগুলো মুদ্রা পুরে দিয়ে বললেন—"তাড়াতাড়ি আমাদের স্নান-তর্পণ করিয়ে দিন্। এই আপনার দক্ষিণা। মুঠি আগেই খুলবেন না।"

পুরোহিত পূজোয় বসেছেন, এমন সময় অদূরে ঢাকের শব্দ ও নগররক্ষীর উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—'বাদশাহের বন্দী পালিয়েছে; যে ধরে আনতে পারবে তাকে হাজার আসরফি পুরস্কার দেওয়া হবে।'

পুরোহিত অন্যমনস্ক হয়ে ঢাকের শব্দে কান দিয়েছিলেন; ফিরে আর সন্ন্যাসীদের দেখতে পেলেন না। হাতের মুঠি খুলে দেখেন—নয়টি মোহর ও নয়টি মণি। এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণ জীবনে কোন দিন দেখেননি। আনন্দ ও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন,—এই সন্ন্যাসীরা কে? ছদ্মবেশী বিশ্বেশ্বর, না সিদ্ধার্থের মত সংসার-ত্যাগী কোন রাজপুত্র?

তাইত! কারা এই সাধু? এদের গন্তব্যস্থানই বা কোথায়? পথের দিকে কোন লক্ষ্য নেই, কোন দর্শনীয় সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণ নেই; শুধু চলা আর চলা, পথচলার আগ্রহেই তা'রা যেন অধীর হয়ে উঠেছে।

এবার দু'জন ঊর্দ্ধশ্বাসে দক্ষিণদিক অভিমুখে ছুটে চলেছেন। আগে খর্ব্বদেহ মোহন্তজী, পিছনে দীর্ঘকায় শিষ্য। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সন্ন্যাসীদ্বয় বোধ হয় উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্থানগুলো পরিক্রমা করবার সঙ্কল্প করেছেন।

এইভাবে দুই মাসের অধিককাল পথ চ'লে সন্ন্যাসীদ্বয় একদিন সন্ধ্যায় বিজাপুর রাজ্যের এক পল্লীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। শিষ্য পথশ্রমে অবসন্ন। পায়ে হাঁটা অসম্ভব দেখে এক কৃষকের নিকট থেকে একটি টাট্টু কিনতে গেলেন। দাম দেবার সময় রৌপ্যমুদ্রা সঙ্গে না থাকায় মোহর দিলেন ঘোড়ার

মালিকের হাতে। সে তো অবাক! ঘোড়ার দাম এক মোহর!

লোকটি ধূর্ত্ত। প্রথমে কি একটু মনে মনে ভেবে নিয়ে তারপর বলল—"না, এ ঘোড়া আমি দিতে পারব না। চল ফৌজদারের কাছে যাই; সেখানেই দাম দেওয়া-নেওয়া হবে।"

শিষ্য কৃষকের হাতে মোহরের থলে দিয়ে বললেন—"আমাদের তীর্থযাত্রায় আর বাধা দিও না, বাপু! এই নিয়ে ঘরে যাও। আমাদের আশীর্ব্বাদে তোমার কল্যাণ হবে।"

ক্লান্ত পথিকদ্বয় বিশ্রামের জন্য আর অপেক্ষা না ক'রে পথে বা'র হয়ে পড়লেন।

কিছুদিন পরের ঘটনা। একদা প্রভাতকালে রাজগড়ের প্রাসাদভবনের দ্বারদেশে উত্তর দেশ হ'তে আগত দু'জন পরিব্রাজক রাজমাতার দর্শন প্রার্থনা জানালেন। প্রহরী অন্তঃপুর হ'তে অনুমতি এনে তাঁদের রাজপুরীর মন্দির-প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল। শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা রাজমাতা জীজাবাঈ সন্ন্যাসীদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর স্থির প্রশান্ত নয়নে অপার মাতৃস্নেহের প্রকাশ; কি মহীয়সী কল্যাণময়ী মাতৃমূর্ত্তি। প্রভাত-তারার শুচিতা সর্ব্বাঙ্গে মেখে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন যেন করুণার প্রতীক! তাঁর অঙ্গ হ'তে চন্দনের মৃদু সুবাস ভেসে আসছে। ভবানী মন্দির হ'তে এইমাত্র বোধ হয় পূজা সমাপন করে এসেছেন।

মোহন্ত দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন—"মা ভবানী আপনার কল্যাণ করুন।"

শিষ্য এগিয়ে গিয়ে রাজমাতার পায়ের উপরে মাথা রেখে প্রণাম করতেই তিনি বিস্ময়ে বিব্রত হয়ে বললেন—"থাক্ বাবা, তুমি যে সন্ন্যাসী।"

সন্ন্যাসী মাথার টুপী খুলে ফেলে হাসিমুখে মায়ের মুখের দিকে চাইলেন। মুহূর্ত্তে রাজামাতার প্রসন্ন মুখশ্রী আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আগ্রহ ও উল্লাসের আতিশয্যে তিনি ব'সে প'ড়ে সন্ন্যাসীর মাথা নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিলেন এবং বুকে চেপে বললেন—"তুই শিবা, আমার শিবা, আমার হারান মাণিক !"

শিবাজী মায়ের বুকে মাথা রেখে মায়ের দ্রুত হৃদয়স্পন্দন অনুভব করতে লাগলেন। জননীর আনন্দাশ্রু সন্তানের মস্তক অভিষিক্ত করল। এতদিনে বুঝি সন্ন্যাসীদের তীর্থযাত্রা সফল হ'ল।

মায়ের চরণস্পর্শে ও অশ্রুগঙ্গায় স্নান ক'রে শিবাজী যেন বাঞ্ছিত তীর্থফল লাভ করলেন।

সমস্ত সহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল, রাজা শিবাজী মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজীবের চক্ষে ধূলো দিয়ে নিরাপদে ফিরে এসেছেন। মুহুর্মুহু তোপধ্বনি হ'তে লাগল। ঘরে ঘরে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে আনন্দবিহ্বল জনসাধারণ উৎসবে মত্ত হ'ল।

কিন্তু—কিন্তু শম্ভুজী কই ? নয়নের নিধিকে ফিরে পেয়ে জীজাবাঈএর শম্ভূজীর কথা প্রথমে মনে পড়েনি। পরে জিজ্ঞাসা করলেন—"শম্ভু কই ?"

শিবাজী নিরুত্তর। নিরাজী, যিনি মোহন্ত সেজেছিলেন, বললেন—"তাকে আমরা পথে হারিয়েছি !"

কয়েক মুহূর্ত্ত সবাই হতবাক, স্তম্ভিত ! তারপর অন্তঃপুর হ'তে বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদ শুনে সকলে বুঝল রাণী সইবাঈ পুত্রের দুঃসংবাদ জানতে পেরেছেন। রাজকুমারের মৃত্যু-

সংবাদে রাজ্যের মধ্যে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'ল। রাজপুরী বিষাদে শোকে থমথম করতে লাগল।

যথাসময়ে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। তার কিছুদিন পরে মথুরাবাসী চারজন ব্রাহ্মণ রাজদর্শনে সভায় এসে উপস্থিত হলেন। তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ বালক—গলায় যজ্ঞসূত্র, কপালে রক্তচন্দনের তিলক।

ব্রাহ্মণগণ দু'হাত তু'লে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করলেন—"জয়তু ভবানী, জয়তু মহারাজ শিবাজী!"

রাজা প্রত্যভিবাদন ক'রে ব্রাহ্মণদিগকে সাদরে আসন দান করলেন। তারপর তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণকুমারের হাত ধ'রে অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে মায়ের সম্মুখে গিয়ে বললেন—"মা, দেখ দেখি এই ব্রাহ্মণবালকটি কে? একে চিনতে পার কিনা?"

জীজাবাঈ বিস্ফারিত চক্ষে ব্রাহ্মণ-বালকের দিকে চেয়ে রইলেন, কে যে এই বালক তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

শিবাজী হাসিমুখে বললেন—"মা, এই তোমার শম্ভুজী। দেখ তো কেমন নিখুঁত ব্রাহ্মণ-বালক!"

জীজাবাঈ নাতিকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন—"আমার শিবরাত্রির সলতে, আমার বংশের দুলাল। মা ভবানী, তুমি মঙ্গলময়ী মা!"

শিবাজী হেসে বললেন—"এখন বুঝতে পারলে মা ?

মৃত্যুসংবাদ না রটালে তোমার শম্ভুর নিরাপদে ফিরে আসা

হ'ত না। হয়তো বা মোগলের হাতে চিরজীবন ওকে বন্দী হয়েই থাকতে হ'ত।"

রাজসভায় ফিরে শিবাজী ঘোষণা করলেন—"এই তিনজন মথুরাবাসী মারাঠী ব্রাহ্মণ আমাদের পরম বিশ্বাসের কাজ করেছেন। পরাক্রান্ত মোগলের শত্রুতা বরণ ক'রেও এঁরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং রাজকুমারকে নিজেদের পরিবারভুক্ত লোক ব'লে পরিচয় দিয়ে আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন। আজ থেকে এঁদের উপাধি হবে 'বিশ্বাস রাও'। আমাদের পরম হিতৈষী এই ব্রাহ্মণ পরিবারকে পুরস্কার স্বরূপ একলক্ষ মোহর ও বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের জায়গীর দান করা হ'ল।"

সভাজন উল্লাসধ্বনি করলেন। সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে আনন্দের স্রোত বইতে লাগল।

—শেষ—